কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে

প্রথম ইংরাজি সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ১৯৯৮
বাংলা সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ ঃ ২২ আগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

১৯৯০-এর দশকে কাশ্মীরে উদ্ভুত জটিল এক পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে কাশ্মীর বিষয়ে আমাদের দলের অতীতের মূল্যায়ন কি তখনও কার্যকরী, নাকি সমস্যার নতুন বিচার ও নতুন সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এই পুস্তিকাটি ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশ করেছিল ১৯৯৮ সালে।

বর্তমানে বি জে পি কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় পুনরায় বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে বসার সুযোগ নিয়ে গত ৫ আগস্ট, ২০১৯ আকস্মিক এক ঘোষণার দ্বারা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করে দেয়। এই অবস্থায় আবার ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও কাশ্মীর নিয়ে নানা প্রশ্ন নতুন করে জনমনে দেখা দিয়েছে, যা বিবেচনা করেই পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

২২ আগস্ট, ২০১৯
৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

৩৭০ ধারা বাতিল কাশ্মীরের জনগণকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকেই বাড়তি শক্তি দেবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ আগস্ট, ২০১৯ এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পরামর্শে ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা যেভাবে আকস্মিক এক ঘোষণার মাধ্যমে সকল গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি পদদলিত করে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হল, জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করা হল এবং জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নামিয়ে আনা হল, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করছে।

স্মরণ করা দরকার যে, ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কাশ্মীর, যা তখনও একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে অবস্থান করছিল, তাকে হয় ভারতবর্ষে না হয় পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অথবা স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় পাক হানাদার বাহিনী কাশ্মীর দখলের জন্য আক্রমণ চালায় এবং কাশ্মীরের একটি অংশে পাকিস্তানের শাসন কায়েম করে। কিন্তু কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরের বৃহদংশের জনগণ স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদান করে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কিছু অধিকার সংরক্ষণের শর্তে, যেগুলি ৩৭০ ধারা হিসাবে ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়। এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল কাশ্মীরের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পথে সেখানকার জনগণকে জয় করে ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের সাথে একাত্মকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কাশ্মীরে শাসন চালায়, ৩৭০ ধারার শর্তাবলিকে ক্রমে লঘু করে দেয়, যা কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয় যার সুযোগ নিয়েই পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভিত্তি করে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং এই পথে জম্মু ও কাশ্মীরের পৃথকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সর্বাত্মক সমর্থন ও মদত দিতে থাকে।

ভারতে একের পর এক কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারগুলি নিজেদের ভুল সংশোধন করার পরিবর্তে কাশ্মীরের জনগণের উপর নির্মম দমন-পীড়ন চালায়, যা কাশ্মীরের যথেষ্ট পরিমাণ অংশের জনসাধারণকে বিরূপ করে তোলে এবং ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতই শক্ত করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে যখন জরুরি ছিল ৩৭০ ধারার পূর্ণ প্রয়োগ করে কাশ্মীরের জনগণের হৃদয় জয় করা ও তার দ্বারা পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করা, তখন হঠাৎ এভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল শুধু কাশ্মীরের জনগণকেই আরও দূরে ঠেলে দেবে তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকেও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে। সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা প্রতিবাদী স্বরকে কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ করা যায়, কিন্তু সব সময়ের জন্য করা যায় না, বরং তা বিরোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সরকারের কাছে আমাদের দাবি, ৩৭০ ধারা সহ কাশ্মীরের জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

দেশের সকল বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান— বিজেপি সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে সোচ্চার হোন। কাশ্মীরের জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে বিপথচালিত না হয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের অংশ হয়ে তাঁরাও প্রতিবাদে কণ্ঠ তুলুন।

কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে

'কাশ্মীর সমস্যা' দীর্ঘদিনের একটি গুরুতর সমস্যা, যা নিয়ে জনগণের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ ক'রে আমাদের পার্টির মুখপত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, একটি ১৯৬৪ সালে বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'তে এবং অন্যটি ১৯৬৫ সালে তৎকালীন ইংরাজী মুখপত্র 'সোস্যালিস্ট ইউনিটি'তে। তারপর অনেকগুলি বছর পার হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু নতুন ঘটনা ও পরিবর্তন ঘটেছে। যেজন্য প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এইসব পরিবর্তনের চরিত্র কি মৌলিক ? এবং এগুলিকে বোঝা ও বিচার করার জন্য নতুন দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন কি ? কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় ভারতীয় সংবিধান কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রক্ষার যে গ্যারাণ্টি দিয়েছিল এবং যে বিশেষ মর্যাদা কাশ্মীর ভোগ করছিল, কেন্দ্রে নানা সময়ে ক্ষমতাসীন নানা শাসক দলের ও তাদের নানা নেতার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত ভারত সরকার সেই বিশেষ মর্যাদাকে যেরকম সুপরিকল্পিতভাবে ও কঠোর হাতে পর্যায়ক্রমে হরণ করেছে, তার একটা গভীর অনুসন্ধান সমস্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের পক্ষ থেকে অবশ্যই হওয়া দরকার। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশী সময়। এই সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি যেমন কাশ্মীর নিয়ে নানা কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, তেমনি উগ্রপন্থীদের দমন করার নামে ভারতীয় সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীগুলি কাশ্মীরী জনগণের উপর নামিয়ে এনেছে অবর্ণনীয় অত্যাচার। যার ফলে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল বিরূপতা, ঘৃণা ও ক্রোধের জন্ম হয়েছে এবং কোন কোন মহল থেকে এমনকি 'আজাদীর' শ্লোগান পর্যন্ত তোলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই ঘটনা কি কাশ্মীর পরিস্থিতির এক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করছে? প্রশ্ন উঠেছে, কাশ্মীরের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের পার্টির আগেকার মূল্যায়ন কি বদলানো দরকার? নাকি, মূলত পার্টির পূর্বেকার বক্তব্যের আধার এবং পরিধির মধ্যে থেকেই পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধি গড়ে তোলা দরকার? এই বিষয়গুলিই ঐতিহাসিক পটভূমি এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলির সাহায্যে বর্তমান দলিলে আলোচনা করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান সমস্যাগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় যাওয়ার আগে মহারাজা হরি সিং-এর সরকার কর্তৃক কাশ্মীরের ভারতভুক্তির নেপথ্য ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করা প্রয়োজন। হয় ভারত, না হয় পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নটা সেসময় কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরেরই একার ছিল না। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রূপে এই প্রশ্নের উদ্ভব এখানে ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শুধু দেশভাগই করেনি, এই উপমহাদেশকে বহু ছোট-বড় ভূখণ্ডে খণ্ডিত (balkanised) করে গিয়েছিল।

নেপথ্য ইতিহাস

ভারত-পাক উপমহাদেশে তখন দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত নানা ধরনের ও নানা আকৃতির ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য (princely states) ছিল। এর মধ্যে ১৪০টি রাজ্য ছিল পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন (fully empowered) রাজ্য। ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে যখন এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটে, তখন ব্রিটিশ রাজ-এর তৎকালীন প্রতিনিধি হিসাবে ব্রিটিশ-ভারত সরকারের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, তার সবই এইসব পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি ভোগ করত। জম্মু ও কাশ্মীর ছিল দেশীয় রাজা দ্বারা শাসিত এরকমই একটি রাজ্য। প্রশ্ন দেখা দিল, নতুন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে এইসব রাজ্যগুলি কোন্ ধরনের সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করবে? এই প্রশ্নে সেসময় "মেমোরাণ্ডাম অফ স্টেটস্ ট্রিটিজ এ্যাণ্ড প্যারামাউণ্টসি" নামে এইসব রাজ্য এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ঘোষণাপত্রে বলা হয় ঃ ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, সেই "শূন্যতা পূরণ করতে ব্রিটিশ ভারতে পরবর্তী সময়ে যে সরকার বা সরকারগুলি ক্ষমতায় আসবে, তার বা তাদের সাথে এইসব রাজ্যগুলি ফেডারেল সম্পর্কে আবদ্ধ হবে; তা করা সম্ভব না হলে, সেই সরকার বা সরকারগুলির সঙ্গে তারা বিশেষ রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় উপনীত হবে" (*দি স্টোরি অফ দি ইন্‌টিগ্রেশান অফ দি ইণ্ডিয়ান স্টেটস্ — ভি পি মেনন, পৃঃ-৮৪*)। চুক্তির ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত "বিশেষ রাজনৈতিক বোঝাপড়া"র বাস্তব অর্থ নিয়ে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। কী এর অর্থ — এর অর্থ কি স্বাধীনতা, নাকি বৃহত্তর স্বশাসন? তদুপরি, এই রাজ্যগুলিকে "সম্পূর্ণ স্বাধীন ভিত্তিতে" ("on the basis of complete freedom") ব্রিটিশ ভারতের পরবর্তী সরকারগুলির সাথে আলাপ-আলোচনা চালানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল (*ম্যাউণ্টব্যাটেনের উক্তি, মেনন কর্তৃক উদ্ধৃত*)।

সেই সময়কার পরিস্থিতিতে উদ্ভূত শূন্যতার মধ্যে কি ধরনের সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছিল, তার ইঙ্গিত ছিল ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদের মহারাজা-শাসিত সরকারগুলির স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে। এঘটনাও জানা ছিল যে, জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংও একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার কথা ভাবছিলেন। অন্যান্য পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যগুলিও একই পথে পা বাড়াবে, এই সম্ভাবনা একটা সময় প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে, ভারত ও পাকিস্তানী জাতীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি নানা স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের উদ্ভব বাধ্য হয়ে

মেনে নিতে হবে — এরকম একটা সম্ভাবনার মুখোমুখি হয় ভারত ও পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী। এ ধরনের সম্ভাবনা ঠেকাতে দুই দেশের শাসকশ্রেণী, প্রথমত, ঐসব রাজ্যগুলির সঙ্গে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এধরনের চুক্তি ঐ রাজ্যগুলির দিক থেকেও প্রয়োজন ছিল। কারণ, ব্রিটিশ শাসনকালে সাধারণভাবে রেলপথ, সড়ক যোগাযোগ, ডাক ও তার, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে তারা নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূন্যতার সাথে সাথে এই ক্ষেত্রগুলিতেও শূন্যতার সৃষ্টি হলে, এইসব রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তা ঘোরতর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠত। দ্বিতীয়ত, পূর্বে উল্লিখিত ঘোষণাপত্র এবং ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ায় দুই দেশের শাসকশ্রেণী, এই রাজ্যগুলিকে — ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই দেশের কোনো একটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্তির দলিলে বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বাক্ষর করাতে যেমন চেষ্টা করেছে, পাশাপাশি জোর খাটিয়েছে, এমনকি এদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পর্যন্ত চালিয়েছে। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান অনুসারে, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে এই রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড (criteria) ছিল মূলত রাজ্যগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম এবং রাজ্যগুলির অবস্থানগত সংলগ্নতা।

এই প্রেক্ষাপটেই জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিচার করতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীর একটি মুসলিম প্রধান রাজ্য, যার শাসনভার ছিল একজন হিন্দু রাজা হরি সিং-এর হাতে। সেদিক থেকে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা পাকিস্তানের সঙ্গে। অথচ মহারাজা স্বাধীন থাকার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু মহারাজার মতামতই জম্মু ও কাশ্মীরে শেষ কথা ছিল না। অন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও কাশ্মীরের রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছিল, যথা, শেখ আবদুল্লা, ন্যাশানাল কনফারেন্স সংগঠন এবং কাশ্মীর উপত্যকার জনগণ। এটাই ইতিহাস যে, শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ন্যাশানাল কনফারেন্স, কাশ্মীর উপত্যকার জনগণকে নিয়ে সামন্তী রাজার বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তা এক কাশ্মীরী আত্মসচেতনতার (national identity) জন্ম দিয়েছিল। কাশ্মীরী জনগণের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, অন্তর্ভুক্তির মূল মানদণ্ড ধর্মভিত্তিক দুই জাতি তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। একইভাবে, ভারত ও পাকিস্তান — দুই দেশের মধ্যে কার সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর যুক্ত হবে, তা কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জাতীয় মতামতকে উপেক্ষা করে স্থির করার অধিকার মহারাজার হাতে ছেড়ে দিতেও কাশ্মীরী জনমত সম্মত ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দখল করতে পাকিস্তান সামরিক অভিযান চালায়। হানাদাররা প্রথম বাধা পায় শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশানাল কনফারেন্সের দ্বারা সংগঠিত 'গণবাহিনী'র (people's militia) কাছ থেকে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে এবং একইসঙ্গে, শেখ আবদুল্লার

নেতৃত্বাধীন ন্যাশান্যাল কনফারেন্স এবং উপত্যকার গরিষ্ঠ জনগণ — যারা কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে কাশ্মীরে পাকিস্তানের আক্রমণকে তাদের 'আজাদীর' উপর আক্রমণ বলেই মনে করেছে এবং যারা চেয়েছে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই সংযুক্ত হোক, তাদের উৎসাহ ও পূর্ণ সমর্থনে মহারাজা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই প্রসঙ্গেই বুঝে নেওয়া দরকার, যেহেতু কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কাশ্মীরী জনগণ তাদের নিজস্ব গণসংগঠন ন্যাশানাল কনফারেন্স এবং তাদের অবিসম্বাদী নেতা শেখ আবদুল্লার মাধ্যমে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে অনুমোদন করেছিল, তাই ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি শুধু আইনসঙ্গতই নয়, নৈতিকভাবেও সঙ্গত ছিল।

এই সন্ধিক্ষণে, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন — যা কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে দেয়। তিনি প্রস্তাব দেন, হামলাকারীদের পরাজয় এবং কাশ্মীরে শান্তি পুনরুদ্ধার হওয়ামাত্রই কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নটি গণভোটের (plebiscite) দ্বারা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নির্দ্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, গভর্ণর জেনারেল হিসাবে তিনি কাশ্মীর সমস্যা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মাউণ্টব্যাটেনের দুটি সিদ্ধান্তই মেনে নেন। শুরু হয় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে কাশ্মীরের দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা। এটাও বোঝা জরুরী যে, জনগণের ইচ্ছা নিরূপণ করার জন্য জনমত সংগ্রহের তথাকথিত 'পবিত্র গণতান্ত্রিক উপায় হিসাবে' গণভোটের আওয়াজ — বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশের ভেতরকার সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলির হাতে জম্মু ও কাশ্মীরে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপ জোরদার করার এক সহজ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

এস ইউ সি আই'র মূল্যায়ন সঠিক ছিল

কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের প্রবন্ধ দুটিতে যে রাজনৈতিক লাইন ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, সেটাই আজ পর্যন্ত আমাদের পার্টি অনুসরণ করে চলেছে। এই রাজনৈতিক লাইন দাঁড়িয়ে আছে, মূলত তৎকালীন কাশ্মীরের বুকে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার দুটি মূল বিষয়ের উপর ঃ

১) ".....কাশ্মীর কেবল আইনগত ও বিধিগত (legally & juridically) দিক থেকেই ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় ; প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাশ্মীরের ভারতভুক্ত হওয়াটা, বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকেও বাস্তবসম্মত এবং সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়।" (১৯৬৫)

২) "তিনি (শেখ আবদুল্লা) কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চান। তিনি

কখনও স্বাধীন কাশ্মীরের কথা বলেন নাই। ......(এই অবস্থায়) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাওয়ার অর্থ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছাড়া আর কি হইতে পারে? তবে স্বায়ত্তশাসনের সিদ্ধান্ত এবং ভারতের সহিত যুক্ত থাকিবে কি না, তাহার সিদ্ধান্ত কাশ্মীরবাসীগণই গ্রহণ করিবে। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে না। কিন্তু কাশ্মীর, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আর একটি প্রদেশেও পরিণত হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার থাকিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে কাশ্মীরের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। ইহাই যদি শেখ আবদুল্লার যথার্থ মনোভাব হয়, তবে আমরা মনে করি, ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর উচিত ইহারই ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা। প্রয়োজন হইলে সংবিধান সংশোধন করা বা প্রশাসনিক অন্যান্য অন্তরায় যদি কিছু থাকে, তা অবিলম্বে অপসারণ করা।" (গণদাবী, ১৯৬৪)।

১৯৬৪ সালে আমাদের উপরোক্ত এই বিশ্লেষণ যে বাস্তবসম্মত ছিল, তা 'ফ্লেমস্ অফ চিনার' নামে প্রকাশিত শেখ আবদুল্লার আত্মজীবনীতে তাঁর নিজের কথাতেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে তিনি বলে-ছিলেন, "কেন্দ্রকে আমি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমরা শুধু চেয়েছি, ৩৭০ ধারা তার আদিরূপ ছ্স্জন্দ্বদ্রপ্ত ন্দ্রস্জপ্গ্ন নিয়ে চালু থাক।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃ-১৬৪*)

একথাও মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির আইনগত, বিধিগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে ১৯৬৫ সালে আমরা যে বিশ্লেষণ রেখেছিলাম, তা যে শেখ আবদুল্লার বিচারধারার অনুরূপ ছিল, সেটা জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে শেখ আবদুল্লার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

সেখানে তিনি বলেছিলেন, ".....মহারাজার ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত আইনের দিক থেকে বৈধ ছিল কি ছিল না? ভারতভুক্তির আইনগত বৈধতা নিয়ে কোন দায়িত্বশীল বা স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বা কোন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই গুরুতর কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের সাংবিধানিক ঘনিষ্ঠ বন্ধনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনারা নিঃসন্দেহে ওয়াকিবহাল। ভারতের সঙ্গে এই বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরে আমরা গর্বিত। .....ভারতীয় সংবিধান একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ার কথা বলেছে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে, দেশের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে আমাদের পৃথকভাবে বিচার করছে। অন্তর্ভুক্তির দলিলে উল্লিখিত বিষয়াবলীতে একমাত্র প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগের বিষয়গুলি বাদ দিলে বাকী সব বিষয়ে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান রচনার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। আমাদের জনগণের বিকাশ ও অগ্রগতির স্বার্থে এক সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে আমরা যাতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার

হিসাবে চলতে পারি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারি সেজন্য আমি আপনাদের বলব — আমাদের জনগণের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য এবং সৃজনীক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের দেশকে গড়ে তোলার স্বাধীনতা যাতে আমাদের হাতে থাকে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার সাথে সাথে, যুক্তরাজ্যের ছত্তুনস্পংগ্ন সঙ্গে যথোপযুক্ত সাংবিধানিক বোঝপড়া গড়ে তুলে, এই মহান কর্তব্যে যুক্তরাজ্যের সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া এবং তা দিতে বাধ্য করার অধিকারও আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং একইসঙ্গে যুক্তরাজ্যকে আমরা দিতে পারি আমাদের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, এই শর্ত এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই ৩৭০ ধারা প্রণীত হয়েছে এবং সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির রাজনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে ১৯৬৫ সালে আমাদের বক্তব্য যে যথার্থ ছিল, তা — কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এবং ভারত-কাশ্মীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার সপক্ষে, জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদে পেশ করা শেখ আবদুল্লার যুক্তিধারা থেকেও অনুধাবন করা যায়। তাঁর ধারণা অনুযায়ী তিনি এ যুক্তিও দিয়েছিলেন যে, "একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র তার সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংবিধান গোটা দেশের সামনে সেক্যুলার গণতন্ত্রের লক্ষ্য তুলে ধরেছে — কোনরকম ভেদাভেদ না করে সকলের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারই যার ভিত্তি। এটাই আধুনিক গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিভূমি। এটার দ্বারাই তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় যাঁরা বলেন যে, ভারতের জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু হিন্দু, তাই কাশ্মীরের মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তা পেতে পারেনা ! নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যেকোন ধরনের অস্বাভাবিক বিভেদ ও বিদ্বেষ সাম্রাজ্যবাদেরই উত্তরাধিকার; কোন আধুনিক রাষ্ট্রই — যদি সেই রাষ্ট্র প্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তবে এই কৃত্রিম ভেদাভেদে উৎসাহ যোগাতে পারে না। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়ার দ্বারা ভারতীয় সংবিধান উপযুক্ত ও চূড়ান্তভাবে ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে বর্জন করেছে। কারণ, ধর্মীয় রাষ্ট্র'র অর্থ মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও অন্ধতার দিকে পিছিয়ে যাওয়া।"

"আমাদের কাশ্মীর রাজ্যের জাতীয় আন্দোলনেও সেক্যুলার গণতন্ত্রের এই নীতিগুলির দিকে স্বভাবতই পাল্লা ভারী থেকেছে। এখানকার জনসাধারণ এমন কোন নীতি কখনোই মেনে নেবে না, যা অন্যান্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় বা সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখতে চায়। আমাদের অতীতের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, রাজনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের এই সাদৃশ্য এবং স্বাধীনতার জন্য কষ্টস্বীকারের যে অভিন্ন পথ ধরে আমাদের এগুতে হয়েছে, সেগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যত নির্দ্ধারণ করতে হবে।" তাঁর ধারণা অনুযায়ীই তিনি জোরের সঙ্গে আরো বলেছেন, "রাজার নিরঙ্কুশ

শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে; প্রশাসন এখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে। গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এইসব পদক্ষেপ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক পুনর্গঠনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং সর্বোপরি, তাদের চিন্তা ও মননকে বন্ধনমুক্ত করে স্বাধীন ভিত্তি দিয়েছে। স্বভাবতই ভারতের সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত হই, তাতে সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরাচারী শাসন আবার ফিরে আসার কোন বিপদ নেই।"

এই সূত্রে শেখ আবদুল্লা ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরে জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকেও খতিয়ে দেখেছিলেন । "……মূলত কৃষির উন্নয়নের বিষয়েই" তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "…..'চাষীদের হাতে জমি' — এই নীতিকে আমরা আইনসম্মত করতে পেরেছি এবং তাকে বাস্তবেও সফল রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। .... যে পাকিস্তানে জমিদাররা দাপটের সঙ্গে অবস্থান করছে, যেখানে অসংখ্য সামন্তী সুবিধা ও অধিকার অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে, সেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করলে আমাদের এই সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীগুলিকে তারা মেনে নেবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কি ?"

এই ইতিহাস আমাদেরকে আরও একটি নির্মম সত্য ও বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কতবড় আশা ও স্বপ্ন নিয়ে শেখ আবদুল্লা ভারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগ দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর এই চিন্তাধারা ও উপলব্ধির মধ্যে। ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পর্কের ভবিষ্যত রূপরেখা নিয়ে তিনি আশা করেছিলেন — জম্মু ও কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরকম হস্তক্ষেপ ঘটবে না; বরং ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্ক জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে তাদের সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটাতে সহায়তা করবে। এই প্রেক্ষাপটেই কল্পনা করুন, পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতকর্মে একটির পর একটি ঘটনা শেখ আবদুল্লা ও কাশ্মীরের জনগণকে কত গভীর ও তীব্র আঘাত দিয়েছে !

৩৭০ ধারা ও ভারতের সংবিধান

ভারতীয় গণপরিষদের সেইসময়কার কার্যবিবরণীর পাতায় দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, জনসংঘ ও আর এস এস তো বটেই, কেন্দ্রীয় সরকারের ভিতরের ও বাইরের কংগ্রেসী রাজনীতিকদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, এমনকি যখন সংবিধান রচিত হচ্ছিল, তখন জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন।

"৩৭০ ধারা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপনকালে এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, এ বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখতে পারেননি এবং বলেছিলেন, সংবিধানের এই ধারা, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থাজনিত কারণে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদার প্রস্তাব করেছে। এই রাজ্য ভারতের সঙ্গে একীভূত

হয়ে (merge) যাওয়ার অবস্থায় বর্তমানে নেই। আমরা সকলে আশা করি, ভবিষ্যতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এক্ষেত্রে তাদের প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করবে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির মতোই, তারাও ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে পুরোপুরি একীভূত হয়ে যাবে।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃ-১১৩*)

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই ৩৭০ ধারার সাংবিধানিক মর্যাদার বিষয়টি আলোচনা করে যাওয়া দরকার। একথা সর্বজনবিদিত যে, বিজেপি এই ধারাকে সাময়িক বলে মনে করে। বলরাজ পুরী তাঁর 'কাশ্মীর টুওয়ার্ডস ইনসারজেন্সি' (পৃষ্ঠা ২৫) বইতে লিখেছেন, "১৯৪৯ সালের মে মাসে রাজ্য সরকারগুলির (দেশীয় রাজ্যগুলির) প্রতিনিধিদের সাথে ভারত সরকারের এক বৈঠকে স্থির করা হয়েছিল যে, ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাজ্যের গণপরিষদগুলি নেবে।" সেইমত, ভারতীয় সংবিধানে 'অন্তবর্তী ও সাময়িক' ৩৭০ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছিল, আয়েঙ্গারের মতে যার পেছনকার চিন্তা ছিল ঃ "রাজ্যের গণপরিষদ বৈঠকে বসে, রাজ্যের সংবিধান এবং রাজ্যের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারের সীমা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রপতি, রাজ্য গণপরিষদের সুপারিশক্রমে আদেশ জারী করতে পারবেন — যার দ্বারা হয় ৩৭০ ধারা কার্যকারিতা হারাবে, অথবা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির দ্বারা বিশেষভাবে নির্দেশিত ব্যতিক্রম ও পরিবর্তনসাপেক্ষে তা বলবৎ থাকবে।"

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় সংবিধানের কোথাও বলা নেই যে, ৩৭০ ধারা সাময়িক। এমনকি রাজ্য সরকারগুলি এবং ভারত সরকারের মধ্যেকার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকেও পরিষ্কার যে, অন্তর্ভুক্তির দলিলে বিশেষভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আইন রক্ষার অধিকার কতদূর পর্যন্ত হস্তান্তরিত করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য গণপরিষদেরই এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, যেটাই আয়েঙ্গারের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে।

বলরাজ পুরী আরো জানিয়েছেন (পৃঃ ২৬), "৩৭০ ধারা রদ করা, বা সংশোধন করার কোনো সাংবিধানিক অধিকার ভারতীয় গণপরিষদের, বা তার উত্তরসূরী ভারতীয় পার্লামেন্টের ছিল না। এই অধিকার সম্পূর্ণভাবেই ছিল রাজ্য গণপরিষদের হাতে।" কারণ, "জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা ভারত সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। তা অনুমোদিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে গভঃ অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির দ্বারা, ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্টের দ্বারা, ১৯৪৭ সালের দি ইণ্ডিয়ান (প্রভিশনাল) কন্স্টিটিউশান অর্ডারের দ্বারা এবং অন্তর্ভুক্তির দলিলের দ্বারা।" (পৃঃ ২৫)

এই সমস্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার যে, ৩৭০ ধারা সাময়িক, না স্থায়ীভাবে বলবৎ থাকবে — তা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির (দেশীয় রাজ্যগুলির) উপর। বর্তমানে এমন ধরনের একটিমাত্র রাজ্যই অবস্থান করছে — সেটি জম্মু ও কাশ্মীর। এটাই ইতিহাস যে, একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্য

সমস্ত পূর্ণক্ষমতা সম্পন্ন (fully empowered) রাজ্যই, তাদের ক্ষমতার অবশিষ্টাংশও (residual powers) ভারত সরকারের হাতে সমর্পণ করেছে এবং ভারতীয় সংবিধানকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই, ৩৭০ ধারায় অনুমোদিত বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়ে পরিণত হয়। অন্য রাজ্যগুলি যেভাবে তাদের বিশেষ মর্যাদাকে পরিত্যাগ করেছিল, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যও যাতে সেইভাবে তাদের বিশেষ মর্যাদাকে ত্যাগ করে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে পুরোপুরি একীভূত হয়ে যায় এবং অন্য রাজ্য ও প্রদেশগুলির মতই, তারাও যাতে শুধুমাত্র আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভারতেরই আর একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়, তার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাদেরকে দিয়ে তা জোর করে মানিয়ে নিতে ভারত সরকারের আমলাবাহিনীর একজন সদস্য গোপালস্বামী আয়েঙ্গার প্রবল চেষ্টা চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে, শেখ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তীব্র কাশ্মীরী আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ উপত্যকার জনগণ একমাত্র এই বিশেষ মর্যাদা পেলেই সন্তুষ্ট হতে পারে। কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের কাছে বিশেষ মর্যাদা ছিল 'আজাদী'র সমার্থক। এমনকি বলরাজ পুরীও কাশ্মীরী জনগণের এই আবেগ অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, "কাশ্মীরী নেতারা, তাঁদের ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের সপক্ষে বার বার যেকথা বলেছেন, তাহল, পাকিস্তান যেখানে আমাদের দাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে ভারত এসেছে আমাদের 'আজাদী'কে রক্ষা করতে" (ঐ, পৃ-১২)। শেখ আবদুল্লা ভালভাবেই জানতেন, একমাত্র 'আজাদী'র এই চেতনা — যার মধ্য দিয়ে (বলরাজ পুরীর মতে) কাশ্মীরী মর্যাদাবোধেরও প্রকাশ ঘটেছে — সেটাই পারে পাকিস্তানের তীব্র ধর্মীয় আবেদনকে প্রতিহত করতে।

শেখ আবদুল্লার অপসারণ, ৩৭০ ধারার উপর আক্রমণ

এই প্রসঙ্গে একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, কাশ্মীরের সেই সময়কার পরিস্থিতিতে 'আজাদী'র আকাঙ্ক্ষা, আবার একইসাথে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছার অর্থ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্যকিছু ছিলনা। অতএব সামন্তী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের একজন বহু পরীক্ষিত নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোনকিছুই কখনই মেনে নিতে পারেন নি। এই বিষয়ে এক অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব দেখা দিল যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর গোপালস্বামী আয়েঙ্গার পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন এবং জওহরলাল নেহরুও কাশ্মীর প্রশ্নে আয়েঙ্গারের মতো মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এইভাবে যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে শেখ আবদুল্লাকে ভারত সরকারই বাধ্য করেছিল, সেটাই শেষ পর্যন্ত শেখ

আবদুল্লার অপসারণ এবং তাঁকে গ্রেফতার করার ঘটনায় পরিণতি পেয়েছিল।

আরও একটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য হল, সর্দার প্যাটেল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আমলারা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে ধীরে ধীরে বিলোপ করে এবং ধাপে ধাপে ৩৭০ ধারার সুযোগকে খর্ব করে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে একই পংক্তিতে নিয়ে আসার নীতি ও পরিকল্পনাই বাস্তবে কার্যকর করছিলেন।

কাশ্মীরকে পুরোপুরি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য ভারত সরকারের পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ রূপেই শেখ আবদুল্লাকে গ্রেফতার করে তাঁর জায়গায় বকসি গুলাম মহম্মদকে বসানো হয়েছিল।

শেখ আবদুল্লাকে সরিয়ে দেওয়ার অব্যবহিত পরেই, ভারত সরকার আইনসভার ক্ষমতাবণ্টন এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা সংক্রান্ত ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক (জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নির্দেশিকা বার বার সংশোধন করেছিল, যাতে ভারতীয় সংসদের অধিকারের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন রচনার অধিকার সংসদের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের কতটা ব্যাপক ক্ষয় ঘটানো হয়েছে, নিচের ঘটনাগুলি অনুধাবন করলেই তা বোঝা যাবে ঃ

১৯৫২ সালের দিল্লী চুক্তিতে বলা হয়েছিল, "জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি প্রযোজ্য হবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে রাজ্যের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের দ্বারা রূপায়িত ভূমি সংস্কারের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করা যাবে। কাশ্মীরের একটি নিজস্ব পতাকা থাকবে, যদিও ভারতের জাতীয় পতাকাই হবে মুখ্য ও সর্বোচ্চ। রাজ্যে একজন নির্বাচিত প্রধান থাকবেন — যিনি কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভার সুপারিশক্রমে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হবেন। কাশ্মীরীরা হবে ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়াবলী সংক্রান্ত অধিকার ও ক্ষমতার ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভা করবে। রাষ্ট্রপতি, কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা জারীর ঘোষণা করতে পারবেন; কিন্তু যদি সেটা জম্মু ও কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে হয়, তবে তা জারী করার আগে রাজ্যের সম্মতি নিতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়গুলি আরো বিচার বিবেচনা করা হবে এবং চুক্তি করা হবে।" (*সূত্র ঃ এস দয়াল লিখিত 'কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইণ্ডিয়া', পৃঃ-৪৫৯, ২য় অনুচ্ছেদ, ১০-২৩ লাইন*)

কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতা, অধিকার ও রীতিনীতিগুলি কাশ্মীরের বুকে আজ আর কার্যকরী নেই।

"১৯৫৩ সালে কাশ্মীর রাজ্যকে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কর্তৃত্ব ও অধিকারের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৬০ সালে নির্বাচন কমিশনের অধিকারকে এই রাজ্যে সম্প্রসারিত করা হয়। সংবিধানের ১৩৬ ধারার মাধ্যমে এই

রাষ্ট্রকে সুপ্রীম কোর্টেরও আওতাভুক্ত করা হয়েছে।"(ঐ)

"১৯৬৪ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) সংশোধন আদেশানুযায়ী, সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার দরুণ জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, সেরকম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমাদের সংবিধানের সাধারণ বিধিগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও প্রযুক্ত হবে। ফলে, রাজ্য প্রশাসনের ভার রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে তুলে নিতে পারবেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আমাদের সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৫৭ এবং অন্যান্য বিধিগুলি জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।" (ঐ)

"জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ও সরকারের প্রধানেরা এতদিন যথাক্রমে 'সদর-ই-রিয়াসত' এবং 'প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে পরিচিত হয়ে এসেছেন, এখন থেকে তাঁরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতই, যথাক্রমে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরিচিত হবেন।" (ঐ)

শুধু তাই নয়, একথা সকলেই জানেন যে, অন্যান্য রাজ্যগুলির মতই কাশ্মীরের রাজ্যপালও বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে, রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত ও অপসারিত হচ্ছেন।

স্বশাসিত মর্যাদা ক্রমান্বয়ে হরণ

একথা ভুলে গেলে চলবে না, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ স্বশাসিত মর্যাদা ধীরে ধীরে বিলোপ করার এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে কংগ্রেস, কংগ্রেস (ই) জনতা পার্টি, জনতা দল, চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন জনতা দল, বিজেপি এবং যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি বুর্জোয়াশ্রেণীর নানা পরিষদীয় দল ও জোটের দ্বারা পরিচালিত একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকারগুলির পাঁচ দশক ধরে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ।

জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলির এই কলঙ্কজনক ইতিহাস কিছু লক্ষণীয় রাজনৈতিক প্রবণতাকে উদঘাটিত করে দিয়েছে, যা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ স্বশাসিত মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং একই সঙ্গে যা ভারতের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে (body politic) সামগ্রিকভাবে এক নতুন ছাঁচে ঢেলে দিয়েছে। এই প্রবণতার মূল গতিমুখটা যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) কাঠামোর দিকে কম এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার (unitary) দিকে বেশি।

জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ভারত সরকারগুলির একতরফা প্রয়াস শুরু হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযুক্ত করার পথ বেয়েই। এই সংযুক্তি ঘটানো হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে হয় ধাপে ধাপে লাগোয়া প্রদেশগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে, নাহয় একাধিক দেশীয় রাজ্যকে সংযুক্ত করে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের আদেশে প্রদেশের মর্যাদা মেনে নিতে তাদের বাধ্য করে। এইসব দেশীয় রাজ্যগুলি, ভারতের বাকী অংশের সাথে কতখানি ব্যাপকতা ও পূর্ণতা নিয়ে মিশে গিয়েছিল, তা বোঝার জন্য এ তথ্যই যথেষ্ট যে, শুরুতে অন্তর্ভুক্তির দলিলে ভারত সরকারের হাতে বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা ও

যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ছাড়তে হয়নি।

ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করার এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানেই যে, এই ঘটনা প্রমাণ করেছে, বহু উপজাতি (nationalities) অধ্যুষিত সমগ্র ভারতবর্ষেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংহত করতে চায়, যেটা তাদের অখন্ড ও সমসত্ত্ব (homogeneous) চরিত্রেরই পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে, বহু উপজাতি, বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত একটি পুঁজিবাদী দেশে অখণ্ডতা ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী যে চেষ্টা চালায়, বর্তমানে তার ভিত্তি হচ্ছে শক্তি, জোর জুলুম ও দমন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক পথে তারা দেশকে সংহত করতে চায়, যেটা সাধারণভাবে আরো অনৈক্য, আরো বিভেদেরই জন্ম দেয়। অন্যদিকে, সর্বহারাশ্রেণী সর্বদা দমনপীড়ন থেকে মুক্ত পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে, জাতিগত শোষণ নিপীড়নসহ সমস্ত প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির অবাধ সুযোগ সৃষ্টি এবং সার্বিক ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে, যেটাই প্রকৃত ও গণতান্ত্রিক সংহতির পথ প্রশস্ত করে।

কাশ্মীরের এই ঘটনাপ্রবাহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, কাশ্মীর সমস্যাকে আজ যেরূপে আমরা দেখছি, তা কাশ্মীরের বুকে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রতিষ্ঠার উদগ্র আকাঙক্ষারই অনিবার্য পরিণাম। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীরের জনগণের বিশেষ অধিকার ও স্বাধীনতা যেভাবে পদদলিত করা হয়েছে — যা আজ চরম সীমায় পৌঁছে কাশ্মীরের বিশেষ স্বশাসিত রাজ্যের মর্যাদাকে প্রায় পুরোপুরি লুপ্ত করতে বসেছে — তার মূলেও রয়েছে এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঐ আকাঙক্ষা। ইতিহাস একথাই বলে যে, সামন্তী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যে কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়েছিল, তা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে প্রবাহিত আদর্শ ও মূল্যবোধগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের এই শ্রদ্ধা ও সংগ্রামের মনোভাবই মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানের তীব্র ধর্মীয় আবেদনকে অতিক্রম করে, উপত্যকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরকে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে শেখ আবদুল্লাকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করেছিল। উপত্যকার মানুষের মনে ভারতের এই ভাবমূর্তি প্রবল ধাক্কা খেল যখন ভারতের শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এবং তাদের সেবাদাস সরকার, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ঠিক পর থেকেই, অন্যায় স্বেচ্ছাচারী ও নির্লজ্জ পদ্ধতিতে কাশ্মীরী মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতায় উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ শুরু করল। এই ঘটনাকে কাশ্মীরের জনগণ অন্তর্ভুক্তির সময়ে ভারত সরকারের উপর তাদের অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করল। এই ঘটনা, স্বভাবতই, অতি দ্রুত কাশ্মীরী মানুষদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক দূরত্বের ও আহত মনোভাবের জন্ম দিল, যা

আজ যথার্থই অত্যন্ত গুরুতর রূপ নিয়েছে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি উপজাতির (ন্যাশানালিটি) ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির সমান সুযোগই একমাত্র উপজাতিগুলির স্বেচ্ছামূলক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করতে পারে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ এই প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করেছে। এবং পাকিস্তানের মদত ও প্ররোচনায় পুষ্ট মৌলবাদী শক্তিগুলি স্বভাবতই এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে — যা ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরী জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান মানসিক দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সমস্যাটি এখানে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

ভারতের ন্যাশানালিটি সমস্যা

ভারতবর্ষ একটি বহু ন্যাশানালিটি বা উপজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র হলেও এখানে ন্যাশানালিটি সমস্যাটি আপেক্ষিক অর্থে অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছে; যে সংহতি এখানে গড়ে উঠেছে, তা শুধুই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক।

এটাই ইতিহাস যে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের প্রদেশগুলি গঠিত হয়েছিল মূলত প্রশাসনিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে। দেশীয় রাজ্যগুলির সীমানাও চিহ্নিত করা হয়েছিল ইচ্ছামত। ফলে এইসব দেশীয় রাজ্যে বসবাসকারী জনসমষ্টির চরিত্র (demography) ঐতিহাসিক কারণেই ছিল নানারকম।

এটাও ইতিহাসেরই ঘটনা যে, নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের বিষয়টি সরকার এক দশক আটকে রেখেছিল। পরে, প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠিত করার যে পদক্ষেপ তারা নিয়েছিল — যাকে এখন ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন বলে অভিহিত করা হয় — তাও ছিল দায়সারা ও অর্ধ-সম্পাদিত। আবার, দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, সেগুলোকে ভাষার ভিত্তিতে নতুনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারার দাবিরও ভারত সরকার প্রবল বিরোধিতা করেছিল।

এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও, এদেশের আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সর্বহারা বিপ্লবের ভয় থেকে শুধু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপসহীন সংগ্রামের পথকেই পরিহার করেনি, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাকেও ফেলে দিয়েছিল। তারা রাজনৈতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক সংহতির জন্য লড়লেও, সেই সংগ্রামের মধ্যে জাতপাত ও সম্প্রদায়গত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি যেমন যুক্ত করেনি, তেমনি ন্যাশানালিটি সমস্যা সমাধানের আবশ্যিক সংগ্রামটিও করেনি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ এই সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যাগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে। এর ফলে, নানা ন্যাশানালিটির মানুষের ন্যায্য বিক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতেও জন্ম নিয়েছে অসংখ্য আন্দোলন, যদিও দুঃখের কথা এই সমস্ত ন্যাশানালিটির 'এলিট' অংশ এবং সংকীর্ণ বিভেদকামী শক্তিগুলিই এইসব

আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে, তাদের নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই, নানা ন্যাশানালিটির জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতার জন্ম দিয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে ন্যাশানালিটি সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এখানে অনেক উপজাতি বা ন্যাশানালিটিরই জাতি (nation) হিসাবে গণ্য হওয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপাদান ছিল। এই বৃহৎ ন্যাশানালিটিগুলিই ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দ্বারা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ন্যাশানালিটি ভারতে রয়েছে যাদের ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরে নিজস্ব রাজ্যগঠন এবং তার আওতায় তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর আকাঙক্ষা আজও অপূরিত থেকে গিয়েছে। তদুপরি, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় ছোট ও বড় ন্যাশানালিটিগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ভাবনা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও, সংস্কৃতিগত, ভাষাগত এবং 'এথনিক' দিক থেকে তাদের মধ্যে অনৈক্য থেকে গিয়েছে।

এই অনৈক্যের ঘটনা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, কারণ আমাদের দেশে ন্যাশানালিটিগুলির মধ্যে একদল আধিপত্যকারী (dominating) এবং একদল আধিপত্যাধীন (dominated), এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি বহু ন্যাশানালিটি অধ্যুষিত পুঁজিবাদী সমাজের, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক যাই হোক, এটি হল এক অন্তর্নিহিত দুষ্টক্ষত। এককেন্দ্রিক কাঠামোর অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ স্বশাসনে তো নয়ই, এমনকি তুলনায় অধিক স্বশাসিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও, একচেটিয়া পুঁজির শাসনের অধীনে এই ন্যাশানালিটি আধিপত্যবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায় না।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে বিলুপ্ত করার পদক্ষেপগুলির মধ্যে কাশ্মীরী ন্যাশানালিটির উপর ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য কায়েমের প্রচেষ্টাই প্রকট। অথচ জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব ন্যাশানালিটি সমস্যা সম্পর্কে শেখ আবদুল্লা পুরোপুরি সজাগ ছিলেন, তার প্রমাণও রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদে শেখ আবদুল্লা বলেছিলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য যে রাজনৈতিক কাঠামো আপনারা ভবিষ্যতে গড়ে তুলবেন, সেখানে আমাদের রাজ্যে নানা উপজাতীয় গোষ্ঠীর (sub-national groups) অস্তিত্বের বিষয়টিকেও আপনাদের বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে। ...আমাদের সংবিধান, কোনভাবেই, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা কোন বিশেষ অঞ্চলের হাতে ক্ষমতা ও অধিকার কেন্দ্রীভূত হতে দিতে পারে না। এই গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকে যাতে তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত ও উন্নত হতে পারে, তার পূর্ণ সুযোগ আমাদের সংবিধানকে অবশ্যই যোগাতে হবে।"

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এত কিছুর পরও, ১৯৭২ সালেও শেখ আবদুল্লা মনে করতেন যে, ৩৭০ ধারাকে তার আদি চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাকেই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু বলে বুঝতে হবে। সম্পূর্ণ বিদ্বেষমুক্ত

মনে নিজের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, "আমার সহকর্মীরা মনে করেন, যে-দেশে আমরা এত খারাপ ব্যবহার পেয়েছি, সেই দেশের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যত আর আমরা যুক্ত রাখতে পারি না। আমি তাদের বলেছি, আমরা কিছু আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ; যতক্ষণ ভারত সেইসব আদর্শের কথা প্রচার করছে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করতে পারি না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের কোনো স্থান পাকিস্তানে নেই। আমরা ভারতের সঙ্গেই থাকব এবং আমাদের আদর্শ পূরণের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে যাব।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪*)

কিন্তু ইতিহাস বলছে যে, পরবর্তী সময়ে শেখ আবদুল্লা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে একাধিক বৈঠক ও আলোচনার পরিণতিতে ১৯৭৫ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা ৩৭০ ধারাকে তার আদি চেহারায় যথার্থভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেনি। স্বভাবতই, ৩৭০ ধারাকে ১৯৫৩ সালের পূর্ববর্তী চেহারায় ফিরিয়ে আনার দাবি আজও জীবন্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে ন্যাশানাল কনফারেন্স এবং অন্য কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দল ও শক্তিজোটের এটাই মুখ্য দাবি।

কিন্তু, বাস্তব অবস্থার এই দিকটি মেনে নেওয়ার পরও প্রশ্ন উঠতে পারে — ৩৭০ ধারাকে ১৯৫৩ সালের পূর্ববর্তী চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কি এখনও জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে?

গত ছয় বছরে কাশ্মীর পরিস্থিতির পরিবর্তন

একথা অনস্বীকার্য, গত ৬ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মুর কয়েকটি অঞ্চলের পরিস্থিতি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা কয়েকটি গুরুতর ঘটনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কাশ্মীরের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যাদের নীতি ও বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন, তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তাদের সাথে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংঘর্ষ আজ নিত্যদিনের ঘটনা। সবচেয়ে সংগঠিত ও সরব অংশ হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই সরকার থেকেই মূলত মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন। পেশাজীবী মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারবিরোধী কোনো না কোনো সশস্ত্র রাজনৈতিক শক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল। এমনকি রাজ্যের গোটা পুলিশবাহিনীকেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আর বিশ্বাস করছে না। প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে রাজ্য সরকার প্রধানতঃ নির্ভর করছে সামরিক বা আধা-সামরিক বাহিনীর উপর। ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের মতো জাতীয়তাবাদী এবং রাজ্য সরকার বা প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থক দলগুলি, একসময় জনগণের বিভিন্ন অংশের উপর যাদের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, তারা আজ নতুন মাথাচাড়া দেওয়া সশস্ত্র রাজনৈতিক শক্তিগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে ; জনগণকেও তারা

আর তাদের পাশে টানতে পারছে না। শুধু তাই নয়, এদের নেতারা দলের সাধারণ কর্মী ও জনগণকে ফেলে ময়দান পরিত্যাগ করেছে। এইসব পরিবর্তনের চরিত্র বিশ্লেষণ করার আগে, এই পরিবর্তনের পেছনে আশু কারণগুলি নিরূপণ করা জরুরী। এই আশু কারণগুলির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত প্রাথমিক কারণগুলি ঃ যথা, ৩৭০ ধারার ক্ষয়, শেখ আবদুল্লার পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার, একের পর এক পুতুল সরকারকে কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় বসানো, ১৯৭৫ সালের অসম্পূর্ণ চুক্তি এবং বছরের পর বছর ধরে একটানা সামরিক দমনপীড়ন। এর সঙ্গে আর যে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি যুক্ত হয়ে আছে, তাহচ্ছে, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ একটি বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নয়নমূলক নীতি তথা দৃষ্টিকোণ্ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আগাগোড়া ব্যর্থতা।

শেখ আবদুল্লার অভিমত হিসাবে একথাও রেকর্ডে আছে যে, এই প্রাথমিক বা মূল কারণগুলি পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীদের মনোভাবে এক ধরনের পরিবর্তন এনেছিল, তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছিল, যেটা তিনি আদর্শগতভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে গলাবাজি করলেও ভারতের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে যেটা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি শেখ আবদুল্লার সেই দায়বদ্ধতা ছিল নিরবচ্ছিন্ন. দৃঢ় ও অটল। তবুও ভারত সরকার শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন কাশ্মীরী জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিকেই শুধু পদদলিত করেনি ;নানা তুচ্ছ কারণে শেখ আবদুল্লাকে বেশ কয়েকবার জেলে পাঠিয়ে তাঁর প্রতি চরম অশোভন আচরণ করেছে এবং অন্যদিকে কাশ্মীরের মৌলবাদীদের মদত দিয়েছে। যে শেখ আবদুল্লা সামন্ততন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ এবং পরে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে, শের-ই-কাশ্মীর নামে কাশ্মীরের সকল অংশের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত হয়ে এসেছেন, এই মৌলবাদী শক্তিগুলি তাঁকে কাশ্মীরের নতুন প্রজন্মের কাছে 'ভারতের দালাল' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

জনমত প্রকাশের সকল গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ

কাশ্মীরী জনগণের মনে যে ব্যথা ও ক্ষোভ ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছিল, শেখ আবদুল্লার মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলী তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে কে কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনকালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) এবং বিজেপি'র মধ্যে এক ন্যক্কারজনক প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে জম্মু অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে শক্ত প্রাচীর শেখ আবদুল্লা খাড়া করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী তাকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং একাজে বিজেপি-ও তাঁর থেকে খুব পিছিয়ে ছিল না। এভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে জোর করে ব্যাপকভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার ফল হল এই যে, মুসলিম

মৌলবাদীদের দ্বারা অনুসৃত যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এতদিন কাশ্মীরের বুকে মাথা তুলতে পারে নি, তা প্রবল মদত পেল। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক লাইনে প্ররোচনামূলক প্রচার, পুনরুজ্জীবিত ইসলামিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভারতের অখন্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিত্রিত করা, ভারত জুড়ে তীব্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা জাগাবার উদ্দেশ্যে প্রোপাগান্ডা চালাতে দুর্দমনীয় ভয়ানক দ্বেষপূর্ণ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কল্পিত প্রতীক রূপে কাশ্মীরকে ব্যবহার করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস, কাশ্মীর উপত্যকার জনগণ ও পাকিস্তান উভয়ের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ওকালতি করা এবং সর্বোপরি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা, ভারতের নানা প্রান্তে ঘন ঘন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিপজ্জনক শক্তিবৃদ্ধি, কাশ্মীরী পণ্ডিতদের জোর করে উদ্বাস্তু বানাতে জগমোহনকে কাজে লাগিয়ে উপত্যকার মানুষদের উপর নির্মম দমন-পীড়ন নামিয়ে আনা — বিজেপি'র এই সমস্ত ঘৃণ্য ও কপট ক্রিয়াকলাপ, ভারত ও উপত্যকার জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিমুখতা, বিরোধ ও দূরত্বকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, কংগ্রেস(ই)-ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ চালায়। কংগ্রেস (ই)'র সঙ্গে জোট বাঁধতে ফারুক আবদুল্লাকে বাধ্য করা হয় এবং তারপর নির্বাচনে কারচুপি করে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় বিরোধী কণ্ঠ নির্মূল করে দেওয়া হয়। এসব ঘটনা এমনকি সেক্যুলার মনোভাবাপন্ন কাশ্মীরী যুবশক্তি, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সাধারণভাবে কাশ্মীরের অসাম্প্রদায়িক জনগণের আরও আশাভঙ্গের কারণ হয়। কাশ্মীরী উপত্যকার মানুষকে এইভাবে কার্যত কোণঠাসা করে দেওয়া হয়। সংবিধানসম্মত যেসব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও উপায়ে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ রাজনীতিসহ রাজ্যের সমস্ত সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে নিজেদের ভাবনা-চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করতে পারত, তা সবই নির্মমভাবে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস (ই)-ন্যাশানাল কনফারেন্স জোট সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মদতপুষ্ট রাজ্যপাল জগমোহন।

বলাবাহুল্য, সমস্ত গণতান্ত্রিক পথগুলিকে কার্যতঃ রুদ্ধ করে দেওয়ার সামগ্রিক পরিণতিতেই, কাশ্মীরের বুকে নানা মত ও পথের অসংখ্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঘটেছে — যারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার উপায় হিসাবে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। কিন্তু কোন্ পরিস্থিতি এবং কি কি কারণ এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির অভ্যুত্থানের জমি তৈরি করে দিয়েছিল, রাজ্যের ও কেন্দ্রের কোন সরকারই তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখার কোন কার্যকরী চেষ্টাই করেনি। পরিবর্তে, পরিস্থিতি মোকাবিলার নামে তারা পি এস এ ও টাডার মত দানবীয় কালা কানুন চালু করেছে এবং গোটা রাজ্যকে তুলে দিয়েছে সামরিক বাহিনী, বি-এস-এফ ও সি-আর-পি এফের হাতে।

সামরিক বাহিনীর অবর্ণনীয় দমনপীড়ন

গ্রাম, শহর ও শহরতলীগুলিতে সামরিকবাহিনী, বি-এস-এফ এবং সি-আর-পি-এফের দমনযন্ত্র যখন সাধারণ মানুষের উপর ধসের মত নেমে আসে তখন কি ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন সেখানকার মানুষকে সহ্য করতে হয়, কিভাবে মহিলারা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হন, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

নানা সিভিল লিবার্টি সংস্থার নানা সময়ের সরেজমিন তদন্ত থেকে গণনির্যাতনের প্রক্রিয়া এবং তার পরিণতির মধ্যে কতকগুলি একইরকম বৈশিষ্ট্য অনিবার্যভাবেই ধরা পড়েছে। নিচের উল্লিখিত ঘটনাগুলি এরকমই কিছু বৈশিষ্ট্য — যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

১) গোটা রাজ্য জুড়ে সর্বত্র বিভিন্ন নিরাপত্তাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত দুটি কেন্দ্র হচ্ছে, খোদ শ্রীনগরের পাপা-১ (PAPA-1) এবং পাপা-২ (PAPA-II)। একটি বিশেষ এলাকায় সামরিক অভিযানের পর সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে ও যথেচ্ছভাবে এইসব কেন্দ্রে ধরে আনা হয়; জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। এর ফলে ধৃত ব্যক্তিরা প্রায়ই গুরুতর আহত হয়ে পড়েন, তাদের কিডনি অকেজো হয়ে যায়, শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায় এবং লকআপেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়। লক-আপ মৃত্যুর এরকম অসংখ্য ঘটনা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টে মামলা চলছে।

২) সামরিক অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ব্যাপক সংখ্যক মানুষের 'নিরুদ্দেশ' হওয়া সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঐসব ভয়াবহ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রগুলিতে নাম নথিভুক্ত করা এবং তা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই প্রায় নেই। ধৃত ব্যক্তিরা কোথায়, কি অবস্থায় আছে বা আদৌ তারা বেঁচে আছে কি না — সে সম্পর্কে তাদের আত্মীয়-পরিজনদের বছরের পর বছর অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়। যেহেতু কোনো রেকর্ডই রাখা হয় না, তাই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি, বিশেষ কোনো ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কথা প্রায়ক্ষেত্রেই সরাসরি অস্বীকার করে।

৩) গোটা রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত থেকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগ এবং তার প্রশাসনিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। কোনো এলাকায় সামরিক অভিযানকালে, প্রথমে পুরুষদের বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মেয়েদের বাড়ীর মধ্যেই আটকে রাখা হয়। তারপর নিরাপত্তা বাহিনী শুরু করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশির নামে গৃহবন্দী অসহায় অরক্ষিত মহিলাদের উপর অবাধে ধর্ষণ।

৪) নিরাপত্তাবাহিনীদের দ্বারা ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিত হত্যাকে প্রায়শই সরকারী বিবৃতিতে 'গোলাগুলির বিনিময়ে মৃত্যু' এবং 'পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যু' বলে চালানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সিভিল লিবার্টি সংস্থাকে

দেওয়া এক তালিকায় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল-এর মে মাস পর্যন্ত এধরনের খুনের সংখ্যা ৪১৭১ বলে দেখানো হয়েছে। যদিও এই সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেখানো, তাহলেও, পুলিশেরই দেওয়া খুনের এই সংখ্যা কোনদিক থেকেই নগণ্য নয়। ঐ একই তালিকায় একই সময়কালে ৩২,৫৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে বলা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলির কাজের ধারা খেয়ালে রাখলে একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে, তাদের স্বীকৃতি ও ঘোষণায় খুন ও গ্রেপ্তারের যে সংখ্যা তারা দিয়েছে তা হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র।

একের পর এক এই সমস্ত ঘটনাবলী কাশ্মীরের এক অংশের জনগণকে ঠেলে দিয়েছে একদিকে সাহায্যের আশায় পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়াতে, অন্যদিকে ভারতবিরোধী অবস্থান নিতে। ন্যাশানাল কনফারেন্সের ভারতমুখী ও 'সেক্যুলার' রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপক কাশ্মীরী জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

কাশ্মীরের নানা গোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী মতামত

এই পটভূমিতেই বিচার করতে হবে যে, এই পরিবর্তনগুলি কাশ্মীর সমস্যার চরিত্রের কোনো আমূল পরিবর্তন সূচিত করছে কিনা এবং সেজন্য কাশ্মীর প্রশ্নে এতদিন যে রাজনৈতিক লাইন আমরা অনুসরণ করে এসেছি তার আমূল বদল ঘটানোর প্রয়োজন কিনা, নাকি পরিবর্তন যা ঘটেছে, তার চরিত্র পরিমাণগত এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের দ্বারা এই নতুন জন্ম নেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির তাৎপর্য বুঝবার জন্য দরকার হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে উপলব্ধিকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা।

এই রাজনৈতিক চালচিত্রের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহচ্ছে, কাশ্মীরের নানা গোষ্ঠী যে বহুবিধ লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে, তার মধ্য থেকে কোন একটি কেন্দ্রীয় সাধারণ মূল লক্ষ্য বেরিয়ে আসছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তার তার মতামত জোরের সঙ্গে রেখেছে, কিন্তু সেগুলি পরস্পরবিরোধী। যেমন কেউ দাবি করছে ভারতের সঙ্গে পূর্ণ সংযুক্তি। কেউ বলছে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি চাই। কারো প্রস্তাব, ১৯৫৩ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে। আবার কেউ দাবি করছে, যুদ্ধবিরতি রেখাকে স্থায়ী সীমান্তরেখায় পরিণত করতে হবে।

বহু ধরনের রাজনৈতিক দলের মিলিজুলি সংগঠন হুরিয়ত কনফারেন্স — যা মুখ্যত মৌলবাদী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামী'র দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিচালিত — তাদের দাবি হচ্ছে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ".... ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।" তারা ঘোষণা করেছে, মহারাজার অধীনে ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য যেমন অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, সেইরকম অবিভক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য। হুরিয়ত নেতারা

বলেছেন, তাদের প্রস্তাবিত এই রাজ্যের সঙ্গে গিলগিট, আস্‌কার্ডু ও বাল্‌তিস্তানকেও যুক্ত করতে হবে। মনে হয়, এটাই হুরিয়ত কনফারেন্সের 'আজাদী'র ধারণা।

হুরিয়তের প্রস্তাবের প্রথম অংশের মধ্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জম্মু ও কাশ্মীর রাষ্ট্র গঠন করার কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। বরং তাদের এই প্রস্তাব — হয় আরো স্বায়ত্তশাসনসহ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, না হয় পাকিস্তান বা ভারত, কোনো এক দেশের সঙ্গে, সেই বিশেষ দেশের সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যেই পুনর্বিন্যস্ত (rearranged) সম্পর্ক তৈরির কথাই বলে।

হুরিয়ত কনফারেন্সের দাবি অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব

হুরিয়ত কনফারেন্স নেতাদের প্রস্তাব কার্যত ইতিহাসের বর্তমান ধারাকে বিপরীতমুখী করারই এক প্রয়াস। তাদের এই প্রস্তাবকে নানা দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

প্রথমত, ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্টের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে হুরিয়ত নেতারা ঠিক কী পেতে চাইছেন? তারা কি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চাইছেন? যদি তাই হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ।

জম্মু ও কাশ্মীর ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্বের অধীন। ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এই ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটে। দেশভাগের পর ভারত বা পাকিস্তান, কারো হাতেই সেদিন দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বের অধিকার হস্তান্তরিত করা হয়নি। তত্ত্বগতভাবে, এই কর্তৃত্বের অধিকার চলে এসেছিল তৎকালীন দেশীয় রাজ্যগুলির হাতেই। কিন্তু তার দ্বারাই বাস্তবে এই রাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে যায়নি। ভারত বা পাকিস্তান, দুই দেশের কোন একটির সাথে কোন না কোনরূপ সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির দ্বারা তারা যুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় তিন ধরনের বন্ধনের কথা বলা হয়েছিল। এখানে আমরা শুধুমাত্র দুটির উল্লেখ করছি। প্রথমত, স্থিতাবস্থা চুক্তি, ''যেখানে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ রাজ এবং রাজ্যগুলির মধ্যে তপশিলে উল্লেখিত উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে সমস্ত চুক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, 'এই বিষয়ে নতুন ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত' বলবৎ থাকবে।'' *(সূত্র ঃ ভি পি মেনন লিখিত 'দি স্টোরি অফ দি ইনটিগ্রেশান অফ ইণ্ডিয়ান স্টেটস্', পৃঃ ১০৬-১০৭)*

দ্বিতীয়ত, ''অর্ন্তভুক্তির দলিলের দ্বারা প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যোগাযোগ, এই তিনটি বিষয়েই রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমিনিয়ানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উক্ত তিনটি বিষয়ের সারবস্তু ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের সপ্তম তপশিলের ১নং তালিকায় বর্ণিত আছে, যা অন্তর্ভুক্তির দলিলে সংযুক্ত একটি তপশিলে পুনরুল্লেখিত হয়েছে।'' *(সূত্র ঃ ঐ, পৃঃ ১০৫)*

মহম্মদ আলি জিন্না প্রথমদিকে এই সূত্র মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু পরে তিনিও এই চুক্তির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি মেনে নেন।

এই সূত্রগুলি 'দশজন শাসনকর্তা (রাজদরবারের প্রতিনিধি হিসাবে) এবং বারোজন মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত এক আলোচনা (negotiating) কমিটির দ্বারা লিখিত ও অনুমোদিত হয়েছিল।' অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, খুব মসৃণভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করানোর চেষ্টার পাশাপাশি রাজাদের উপর বেশ কিছুটা চাপ সৃষ্টিও করা হয়েছিল। তাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ".....আমাদের আওতার বাইরে গিয়ে আপনারা টিকে থাকতে পারবেন না।" একথা অত্যন্ত পরিষ্কার, অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মহারাজাদের দেওয়া হলেও, বাস্তবে ও প্রকৃত বিচারে, স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হয়নি। ইতিহাসের সেই পর্যায়ে, জম্মু ও কাশ্মীর সহ দেশীয় রাজ্যগুলির এই বিশেষ অবস্থান, শেখ আবদুল্লা ও মাউন্টব্যাটনের চিন্তা থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ২রা অক্টোবর হুইউরি বাগের এক সমাবেশে, কাশ্মীরী জনগণের অধিকার সম্পর্কে শেখ আবদুল্লা বলেছিলেন ঃ

"আমাদের, কাশ্মীরের জনগণকে এখন অবশ্যই দেখতে হবে যেন আমাদের দীর্ঘ আকাঙ্খিত স্বপ্ন — স্বাধীনতার স্বপ্ন, কল্যাণ ও প্রগতির স্বপ্ন সফল হয়। আমরা যতক্ষণ গোলাম হয়ে আছি, ততক্ষণ কোন সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে, আর কালবিলম্ব না করে, একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করাই জরুরী — যে সরকার রাজ্যের জনগণের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। 'অন্তর্ভুক্তির আগে স্বাধীনতা' — এই শ্লোগানই সোচ্চারে আমাদের তুলতে হবে" *(ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃষ্ঠা ৮৬)*। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় "অন্তর্ভুক্তির আগে স্বাধীনতা" এই শব্দগুলি — যার অর্থ, অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের স্বাধীনতা। আরো উল্লেখযোগ্য "অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে মহারাজা স্বাধীন কাশ্মীর চেয়েছিলেন। অন্তর্ভুক্তির দলিলে সই করতে বাধ্য হওয়ার আগে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, কাশ্মীরের অবস্থানগত এবং রাজ্যের জনসমষ্টির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতা চান।" এবং "১৯৪৭ সালের জুনমাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন কাশ্মীর সফরে গিয়েছিলেন, তখন এই রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করে তিনি মহারাজাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নাহ'লে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি তাকে মেনে নিতে হবে।" *(ঐ)*

এককথায়, পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যা ছিল, তা ফিরিয়ে আনলেই জম্মু ও কাশ্মীর তৎক্ষণাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যাবে, ব্যাপারটা এরকম নয়।

বাস্তব অবস্থা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ১৩ই আগস্ট '৪৭-এর অবস্থান পুনর্বহালের মাধ্যমে অবিভক্ত জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা যদি কাম্য হয়, তবে এটা ধরে নিতে হবে যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই যে সমস্ত রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক চুক্তি ও বোঝাপড়া গড়ে তুলেছিল, সেই

সমস্ত চুক্তি ও বোঝাপড়া তারা পরিত্যাগ করবে ;জম্মু ও কাশ্মীরের যে এলাকাগুলি পকিস্তান জোর করে দখল করেছে, সেই সমস্ত এলাকা, অর্থাৎ মুজফ্ফরবাদ, গিলগিট, বাল্তিস্তান থেকে তারা স্বেচ্ছায় সরে যাবে;অন্তর্ভুক্তির দলিলের জোরে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরের বুকে অবস্থান করছে, তাদেরও স্বেচ্ছায় তুলে নেওয়া হবে।

এরপর, যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই উঠবে, তাহচ্ছে — এই পরিস্থিতিতে শাসনক্ষমতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, কিভাবে তা পূরণ করা হবে? হুরিয়তের পুরনো দিনের নেতারা এই প্রশ্নের এক তৈরি জবাব দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রস্তাব হল, সেই পরিস্থিতিতে, ভারত ও পাকিস্তান, উভয়ের সহযোগিতায় এবং রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে কাশ্মীরী জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের বেছে নেওয়া হবে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই দেশের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পর্কের বিষয়ে এক বোঝাপড়ায় উপনীত হতে দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালাবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হুরিয়তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

এই প্রস্তাবের মধ্যেই ফাঁক রয়েছে। প্রথমত, প্রস্তাবকরা নিজেরাই মনে করছে, এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই সহযোগিতা, সম্মতি ও অনুমোদন আবশ্যিক। অথচ ঘটনা হচ্ছে, এই দুই বুর্জোয়া রাষ্ট্রই সম্ভব হলে সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরে, না হলে যে যে অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সেই সেই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিজস্ব কব্জায় রেখে এখানে প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর তীব্র দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তারা রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন চাইছে। রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির রবার স্ট্যাম্প হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ, আগ্রাসন, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তারা এও জানে যে, যেদিন থেকে কাশ্মীর ইস্যু রাষ্ট্রসংঘে তোলা হয়েছে, সেদিন থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে এক দেশকে অন্যদেশের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা ও সংঘর্ষে ফাঁসিয়ে দেওয়ার কৌশল লাগাতার অনুসরণ করে চলেছে। এতদ্সত্বেও হুরিয়ত কনফারেন্স যখন এরকম একটি প্রস্তাব তুলেছে, তখন এই সংগঠনের চরিত্র খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘকে যুক্ত করার তাদের এই প্রস্তাবই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং পাকিস্তানের সঙ্গে হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, হুরিয়ত নেতারা অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিজ নামের সংগঠনটির সাথে এবং বিশেষ করে সৌদি আরব, মরক্কো ও তুরস্কের মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনুগত সরকারগুলির

সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগই শুধু নয়, হুরিয়তের ধর্মীয় রাজনৈতিক চরিত্রও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। হুরিয়ত কনফারেন্সের মূল শক্তি হচ্ছে জামাত-ই-ইসলামীর মতো একটি কুখ্যাত মৌলবাদী সংগঠন, যাদের দোসরদের বিশ্বের সমস্ত ইসলামিক দেশগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই সংগঠনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মিরওয়াজ ওমর।

এই মিরওয়াজ পরিবারের ইতিহাস ও ভূমিকা — যা 'ফ্লেমস্ অফ চিনার' বইতে তুলে ধরা হয়েছে, তা জানা দরকার। ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে, মিরওয়াজ পরিবারের প্রধান কর্তা ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়কে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মহারাজা হরি সিং-এর শাসনের প্রতি মুসলমানদের পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে মিরওয়াজ প্রধান ".....মহারাজা ও তার অনুচরবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলেন।" "১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর .....পাকিস্তানের কয়েকজন দূত মিরওয়াজের সঙ্গে দেখা করেন এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে শ্রীনগরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে তাঁকে অনুরোধ করেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল — তিনি যেন কাশ্মীর ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান, যাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে তিনি এখানে ফিরে আসতে পারেন। রাতের অন্ধকারে মৌলভী সাহেব পাকিস্তানে পালিয়ে যান।"

"জনসমর্থন হাসিল করার জন্য বক্‌সি গুলাম মহম্মদ, মৌলভী ফারুককে .....কাশ্মীরের মিরওয়াজ নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে সরকারী মদত এবং বিপুল আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।" এই ইতিহাস নিঃসন্দেহে কয়েক প্রজন্ম ধরে মিরওয়াজ পরিবারের সততা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়কেই প্রকট করছে। মিরওয়াজ পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর। সে-ও যথারীতি সেই একই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করছে। এই পটভূমিতে হুরিয়ত কনফারেন্সের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি, অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে পৃথক করার দাবির বিরুদ্ধতা করাই অবশ্য কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজনৈতিকভাবে এবং আইনগত ও নৈতিক দিক থেকে বিগত পাঁচ দশক ধরে ভারত যুক্তরাজ্যেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত যুক্তরাজ্য থেকে পৃথক করার দাবির বাস্তব অর্থ হচ্ছে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি। "সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণমুক্ত, স্বাধীন সার্বভৌম বিকাশই আত্মনিয়ন্ত্রণের (যেখানে তা বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয় — সম্পাদক) অধিকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।" (*১৯৬৪ সালে গণদাবীতে প্রকাশিত 'কাশ্মীরের বর্তমান সমস্যাবলী প্রসঙ্গে' থেকে উদ্ধৃত*)।

উপরোক্ত আলোচনা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, হুরিয়ত কনফারেন্সের উপর প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাব কাজ করছে।

পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে

দেখিয়েছিলেন যে, এই সংগ্রাম যথার্থই ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র অর্জন করেছিল, এটা কোনো সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফল ছিল না ; বরং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাই করেছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রযোজ্য হত, যদি সমস্ত দিক থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে দেখানো যেত যে, কাশ্মীরের সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র অর্জন করেছে। এর বাস্তব কোনও প্রমাণের সন্ধান এখনও মেলেনি। কিন্তু একথা একেবারে দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে এবং তার বাইরেও, কাশ্মীর উপত্যকায় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে মদত ও ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে কেবলমাত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে তাই নয়, তারা মূলত আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এই দুই রাষ্ট্র অতি সম্প্রতি কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেভাবে খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করেছে, তা এর মধ্যেই ভুলে যাওয়ার নয়। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন সরকারের প্রতিনিধিরা এখনও কাশ্মীর প্রশ্নে নাক গলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, যার বিরুদ্ধে জনগণকে সদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। স্বভাবতই এইসব ইঙ্গ-মার্কিন প্রয়াসের সুযোগ পাকিস্তানী শাসকরা নেওয়ার চেষ্টা করছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে, আমাদের পার্টির বক্তব্য পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে আমাদের পার্টি বলেছিল, "…..আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ভাঙ্গার পরিবর্তে আরও পাকাপোক্ত হইলে, সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় এ দাবি উঠিলে, তাহা যে শ্রেণীর নেতৃত্বেই উঠুক না কেন;সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাস প্রভুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহা (আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি) সমর্থনযোগ্য তো নয়ই, উপরন্তু বিরোধিতা করাই কতর্ব্য।"

কাশ্মীর গণপরিষদই স্বাধীনতার প্রস্তাব খারিজ করেছিল

স্বাধীনতার শ্লোগানের সঙ্গে যুক্ত আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যও বিচার করে দেখা দরকার। নানা ঘটনার যোগাযোগের ফলে 'আজাদী'র শ্লোগান গোটা রাজ্যের সর্বত্রই কম-বেশী শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ বর্তমানে এ সম্পর্কে উদাসীন। এই শ্লোগানের পিছনে কাশ্মীরের জনগণের কোনো সংগঠিত কর্মকাণ্ড আদৌ দেখা যাচ্ছে না। 'আজাদী'র শ্লোগানের পক্ষে গণসংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন কোনো সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বও এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। 'আজাদী'র শ্লোগান তুলছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি — যারা ভারতের সঙ্গেও থাকতে চায় না, পাকিস্তানেও যোগ দিতে চায় না — তারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তানকে ঘাঁটি করে গড়ে ওঠা সবচেয়ে পরিচিত গোষ্ঠী আমানুল্লার নেতৃত্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (ৠন্ম্ঠ) সম্পর্কেও একথা সত্য। এজন্যই বহুদিন আগেই জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদ

সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই বিকল্প খারিজ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিচার করতে গিয়ে শেখ আবদুল্লা গণপরিষদে বলেছিলেন, "তৃতীয় যে পথটি আমাদের সামনে খোলা রয়েছে, তা নিয়েও আমাদের আলোচনা করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দুই রাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজার রেখে, কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, আমরা নিজেদের পূর্ব সুইজারল্যাণ্ডের মতো করে গড়ে তুলব কিনা, সেই বিকল্প সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ এর মধ্যে রয়েছে — একথা ভেবে এই বিকল্পকে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। একটি পর্যটন নির্ভর দেশ হিসাবে আমরা এই বিকল্প থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা অবশ্যই পেতে পারি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্ন বিচার করার সময় বাস্তব অবস্থা বিবেচনার বিষয়টি আমাদের কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। প্রথমত, আমাদের দেশ একটি ছোট দেশ, যার সাথে অনেকগুলি দেশের সীমানা যুক্ত হয়ে আছে। এই দীর্ঘ ও দুর্গম সীমান্ত এলাকাগুলিকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই। এই অবস্থায় আমাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করা খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, সকল প্রতিবেশী দেশের শুভেচ্ছা আমাদের পেতেই হবে। এদের মধ্যে এমন শক্তিশালী গ্যারাণ্টারদের আমার পাব কি — যারা নিজেদের শক্তিকে একত্র করে, যে-কোনরকম আক্রমণ থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা নিশ্চয়তা দেবে? আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই — ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের রাজ্য স্বাধীন ছিল এবং তার ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, আমাদেরই প্রতিবেশী, যাদের সঙ্গে আমাদের বৈধ স্থিতাবস্থা চুক্তি ছিল , তারা আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। আমাদের রাজ্য আক্রান্ত হয়েছিল। ভবিষ্যতেও, একই ধরনের আক্রমণের শিকার আমরা হব না — এর কোন গ্যারাণ্টি আছে কি?" শেখ আবদুল্লা সেইসময় এই অঞ্চলের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি নজর করেছিলেন, তা আজ আরো খারাপ হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রতিবেশী স্থলবেষ্টিত (land-locked) দেশ আফগানিস্তান। বহু দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে অবস্থিত আফগানিস্তান আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও বহুমুখী আক্রমণের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়েছে। বহুকাল আগে শেখ আবদুল্লার ঐ বিশ্লেষণ আজকের পরিস্থিতিতে সহস্রগুণে সত্য।

একটি প্রশ্ন এখানে দেখা দিতে পারে। শেখ আবদুল্লার এই বিশ্লেষণ ও চিন্তাকে কি সমস্তকালে, সমস্ত পরিস্থিতিতে ধ্রুব সত্য হিসাবে মেনে নিতে হবে? না, এভাবে কোনো মার্কসবাদী চিন্তা করে না। মার্কসীয় চিন্তাপদ্ধতির মূল প্রাণসত্তাই হচ্ছে, বিশেষ পরিস্থিতির বিশেষ মূল্যায়ন। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবার মত ছোট দেশগুলি দেখিয়ে দিয়েছে — কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল সামরিক শক্তিকে পরাভূত করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হয়। কাশ্মীর সম্পর্কে শেখ আবদুল্লা যা বলেছিলেন, তা শুধুমাত্র কাশ্মীরের বিশেষ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিতেই

প্রযোজ্য। তাঁর যুক্তিধারাকে মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচার করতে হবে ; অর্থাৎ কাশ্মীরের ভেতরের ও বাইরের দ্বন্দ্বগুলির প্রকৃতি কি এবং কাশ্মীরের ঘটনাবলীর পেছনে বাইরের ও ভেতরের কি কি কারণ কাজ করছে। এই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতেই শেখ আবদুল্লার সিদ্ধান্তকে আমাদের গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। 'একটি ছোট দেশ কি স্বাধীন হতে পারবে না' — নিছক এমন একটি সাধারণ প্রশ্ন তোলার দ্বারা আমরা কোথাও পৌঁছুতে পারব না ।

কাশ্মীরের নিজস্ব ন্যাশানালিটি সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা

জম্মু ও কাশ্মীরকে তার অবিভক্ত চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে — হুরিয়ত কনফারেন্সের এই প্রস্তাবের আর একটি দিকও পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। পুরনো জম্মু ও কাশ্মীর ছিল তিনটি মুখ্য ধর্ম অনুসরণকারী ৫/৬টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এথনিক ও ভাষাগত আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত রাজ্য। দেশীয় রাজাদের শাসিত পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। মহারাজার শাসনের বিরুদ্ধে, জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের মধ্যেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাগৃতি গড়ে উঠছিল। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি স্মরণে রাখা দরকার। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই সংগ্রাম লাদাক, গিলগিট, বালতিস্তান এবং আস্কার্ডু 'র মত অন্য অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েনি। এইসব অঞ্চলগুলিতে সামন্ততন্ত্রবিরোধী তাদের নিজস্ব কোনো সংগ্রামও গড়ে ওঠেনি। সুতরাং, ঐসব আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোনোরকম জাতীয়তাবাদী জাগৃতিও গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির সকলকে যুক্ত করে কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতিগত আকাঙ্ক্ষা বা স্বাতন্ত্র্যবোধের ভাবনা জম্মু ও কাশ্মীরে কখনই গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তারপর বহু বছর পার হয়েছে। শুধু তাই নয়, জনগণের মধ্যে বিভক্তি নিয়েই জম্মু ও কাশ্মীর এই দীর্ঘ বছর ধরে ভারতীয় বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র ও তার পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার একটি অংশ হিসাবেই রয়েছে, বৃহৎ উপজাতির দ্বারা দমনের (major nationality domination) তিক্ত অভিজ্ঞতাও জনগণ অর্জন করেছে এবং এসবের মধ্য দিয়েই সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উপজাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার (nationality aspiration) জন্ম ও বিকাশ শুরু হয়েছে। এই বাস্তবতাকে আজ ধীরে ধীরে সকলেই স্বীকার করছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের এই সমস্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলি এখন বলছে — "রাজ্যের পাঁচটি অঞ্চলের প্রত্যেকের জন্যই স্বশাসিত প্রশাসন, অথবা, বিধিবদ্ধ আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক বিধানসভা চাই।" সম্প্রতি লাদাকের জনগণ এই অঞ্চলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলেছে — যা স্বীকার করা হলে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লাদাক আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত সেখানে একটি

স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠনে সম্মতি দিয়েছে। একইভাবে, পাকিস্তান সরকার "....গিলগিট ও বাল্‌তিস্তানের জনগণকে ভোটদান এবং একটি আইনসভা নির্বাচিত করার মৌলিক অধিকার মঞ্জুর করেছে।" কিন্তু এর ফলে একটি স্ববিরোধ প্রকট হয়েছে। এদিকে লাদাক এবং ওদিকে গিলগিট ও বাল্‌তিস্তান-এর ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর হওয়ার ফলে কাশ্মীর উপত্যকার দুই পাড়ের নেতারাই এই ভেবে আশঙ্কিত যে, ঘটনা যদি এই খাতে এগুতে থাকে, তবে এই সমস্ত অঞ্চলগুলি ভবিষ্যতে আর জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ থাকবে না !

এসব ঘটনাবলী থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ঃ (১) জম্মু ও কাশ্মীরী কোনও অভিন্ন জাতিসত্তা ও সাধারণ বন্ধনের অস্তিত্ব নেই ;(২) আঞ্চলিক জাতিগত চেতনা এক ক্রমবিকাশমান বাস্তব হিসাবে অবস্থান করছে ;(৩) কাশ্মীর উপত্যকার দুই পাড়ের বুর্জোয়া 'এলিটরা' ইতিমধ্যেই অন্যান্য উপজাতি-গুলির তুলনায় বৃহৎ উপজাতিসুলভ সংকীর্ণতা অর্জন করে ফেলেছে।

এই পরিস্থিতিতে এটা নিতান্তই অলীক কল্পনা যে, কাশ্মীর উপত্যকার দুই অংশের নেতারা অতীতের অবিভক্ত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনার যে ডাক দিচ্ছেন তাতে জম্মু, লাদাক, গিলগিট ও বাল্‌তিস্তানের জনগণ সাড়া দেবেন ! বাস্তবে এ সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলা চলে। সুতরাং, এই সমস্ত উপাদানগুলির সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থান ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাস্তব জমি কার্যত আর নেই।

কাশ্মীরে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য নেই

এই অবস্থায় কাশ্মীর উপত্যকায় যে সশস্ত্র লড়াই চলছে, কী তার চরিত্র — সেই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা হবই। এই লড়াই কি ঔপনিবেশিকতাবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার লড়াই? এই লড়াই কি গণঅভ্যুত্থানের চরিত্র নিয়েছে?

কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস দল ও বিজেপি'র নীতি, পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের সামগ্রিক পরিণতিতে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গণরোষ আজ কাশ্মীরে এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে যারাই লড়ছে — তা যে শক্তিই হোক এবং তার চরিত্র যাই হোক — জনগণ তাদেরকেই সমর্থন করছে। কাশ্মীরের জনগণ এখন পুরোপুরি সরকারবিমুখ। এবং পাকিস্তানী বুর্জোয়া সরকার এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে, তাতে কোনও সংশয় নেই।

এখন, সরকারের বিরুদ্ধে এই গণরোষ, যে-কোনো ধরনের লড়াইয়ের প্রতি গণসমর্থন এবং প্রশাসন থেকে জনগণের মানসিক বিচ্ছিন্নতাকে কি ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা সঠিক হবে? কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস ও বিজেপি'র নীতি, পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, এদের লক্ষ্য হল, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে বিলোপ করা, জম্মু

ও কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের পংক্তিতে নামিয়ে আনা এবং সাম্প্রদায়িক ও মারপ্যাঁচের রাজনীতির মধ্য দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে নিজেদের একটা ভিত তৈরি করা যাতে রাজ্যের সরকারী গদী দখল করা যায়। এইসব পদক্ষেপ যতই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হোক না কেন, একে কি ঔপনিবেশিক ভূমিকা বলা যায়?

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ঔপনিবেশিক শোষণের নানা রূপ রয়েছে। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা, যার মধ্যে মৌলিক অধিকারের গোটা পরিমণ্ডলটি যুক্ত থাকে, তাকেই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ সবচেয়ে আগে এবং স্থায়ীভাবে কেড়ে নেয়। একটি বহু ন্যাশানালিটি অধ্যুষিত দেশে জনগণের এই সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে বোঝায় জাতীয় রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে দেশের সমস্ত ন্যাশানালিটিগুলির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যেই অন্তর্গত থাকে একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের গোটা পরিমণ্ডলটি। একটি বহু ন্যাশানালিটি অধ্যুষিত দেশে, একটি ন্যাশানালিটির উপর ঔপনিবেশিক শোষণের অর্থ তাদের মৌলিক অধিকারের গোটা পরিমণ্ডলসহ এমনকি আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনকেও সম্পূর্ণভাবে দমন করা। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা হচ্ছে, কাশ্মীরের বিশেষ স্বশাসিত মর্যাদার বিলুপ্তি। যার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরকে, ভারত যুক্তরাজ্যের অন্যান্য আপেক্ষিক স্বশাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে একই পংক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে; মৌলিক অধিকারের গোটা পরিমণ্ডল সহ আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সেখানে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে, নানা রূপের ও নানা চরিত্রের স্বশাসনের ছব্দন্দ্বপুন্দ্র-ঋক্ষ্লন্দ্বক্তং-প্লন্দ্ধংব্ধগ্ন বিষয়টি আলোচনা করে যাওয়া দরকার। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সীমাবদ্ধ স্বশাসন কোনো বিরল ঘটনা নয়। তাহলে, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে স্বশাসন এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে স্বশাসন — এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে স্বশাসন শুধু সীমাবদ্ধই নয়, স্বশাসনের সার্বভৌম অধিকারও সেখানে থাকে না। এবং একইভাবে, সেখানে অনুপস্থিত থাকে নাগরিকদের ন্যায্য প্রাপ্য মৌলিক অধিকারের গোটা পরিমণ্ডলটিও। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় স্বশাসন দেওয়া হয় একটা সুবিধা হিসাবে, প্রতারণার কৌশল হিসাবে। এই স্বশাসন, শাসনের সার্বভৌম অধিকারকে প্রতিফলিত করে না। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রদেশগুলিকে যে স্বশাসন দেওয়া হয়েছিল এবং স্বাধীন ভারতে রাজ্যগুলির (পূর্বতন প্রদেশগুলি) ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্বশাসন — এই দুইয়ের মর্মবস্তুই রাজনৈতিকভাবে, ধারণাগত দিক থেকে, আইনী বিচারে ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একই রকম — কেউই নিশ্চয় এরকম দাবি করবেন না। কাশ্মীরের বর্তমান স্বশাসন, যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিরই অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে ব্রিটিশ শাসনকালের স্বশাসনের সঙ্গে এক করে ফেলার অর্থ হবে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সময়ের স্বশাসনের রাজনৈতিক মর্মবস্তুর পার্থক্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। এক কথায়, স্বশাসনের প্রশ্নে জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য আজ দেখা যাচ্ছে না।

কাশ্মীরের বুকে কার্যত যে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে, তার তাৎপর্যের দিকটিও আলোচনা করা দরকার। এই নিবন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, সামরিক বাহিনীই কার্যত কাশ্মীরের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করছে। কাশ্মীরী জনগণের মৌলিক অধিকার কার্যত স্থগিতাবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করব যে, কাশ্মীরের বুকে কার্যত সামরিক প্রশাসন এবং মৌলিক অধিকারের স্থগিতাবস্থার অর্থ হল, আপেক্ষিক স্বশাসন ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার অধিকার থেকে কাশ্মীরী জনগণকে স্থায়ীভাবে বরাবরের জন্য বঞ্চিত করা?

আমাদের স্মরণ করা দরকার জরুরী অবস্থার দিনগুলির কথা, যখন নিজের জীবনের অধিকার, নিজের জীবন রক্ষার জন্য আইনের দরজায় বিচার পাওয়ার অধিকার সহ ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের সমস্ত মৌলিক অধিকারই বাতিল করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে ভারতের কোনো ন্যাশানালিটি কি সমস্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের স্থায়ী বিনাশ বলে মনে করেছিল, যা ঔপনিবেশিক শাসনে ঘটে?

ভারতের গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে আজ কার্যত সামরিক শাসন ও দমনপীড়ন চলছে। এই ঘটনাকে কি ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন ন্যাশানালিটিগুলির উপর ঔপনিবেশিক শোষণ রূপে দেখা হচ্ছে?

একটা সামরিক শাসন যতই ঘৃণ্য ও অপরাধমূলক হোক না কেন, শুধুমাত্র সেটাই কোন একটি ন্যাশানালিটিকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রজা বানিয়ে দেয় না।

উপনিবেশবাদের একটি অঙ্গ হিসাবে সেনাবাহিনী নিয়োগের বিষয়টিও বিচার করা দরকার। উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য সেনাবাহিনীর ব্যবহার ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে।

আগ্রাসী উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, এমনকি বিদেশী সার্বভৌম দেশগুলির মাটিতেও তাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছে — এই ঘটনা দীর্ঘদিনের এক নগ্ন সত্য।

এও দেখা গেছে যে, এমনকি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ — যেখানে জনবসতি নেই বা অতি বিরল, যার বাণিজ্যিক মূল্য অতি নগণ্য বা কিছুমাত্র নেই, কিন্তু সামরিক অবস্থানগত দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ — সেই সমস্ত দ্বীপগুলিকে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, তাদের আগ্রাসী সামরিক ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলেছে। পানামা খালকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে, মার্কিন সামরিক বাহিনী, সেই দেশের জনগণের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে, কার্যত তাদের সাবভৌমত্বকে পদদলিত করে, পানামা খাল এলাকায় প্রায় স্থায়ীভাবে দখলদারি কায়েম করে রেখেছে। সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানোর এই সমস্ত এবং অন্য আরো বহু ভিন্নতর পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অনুসরণ করে, নিঃসন্দেহে যার উদ্দেশ্য হল গোটা দুনিয়াকে পদানত করে তাদের একাধিপত্য কায়েম করা।

কিন্তু এটাও ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, একটি সার্বভৌম দেশ তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে।

এখন স্থির করতে হবে যে, সাধারণভাবে সীমান্ত এলাকায় এবং বিশেষভাবে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েনের ঘটনা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত? ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর আইনসম্মতভাবে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেদিক থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানা আইনসম্মতভাবে ভারতেরই সীমানা। কাজেই, কাশ্মীরের বহুমুখী সীমান্ত এলাকায় সেনা মোতায়েনের ঘটনাকে ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা চলে না। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরে কিভাবে প্রবেশ করেছিল, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার বুঝে নেওয়া দরকার। ভারতীয় সামরিকবাহিনী যখন জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল, যখন চল্লিশের দশকের শেষে এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত করার জন্য শেখ আবদুল্লার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেই সময় আমাদের দলের অভিমত ছিল যে, ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা তখনো কেবলমাত্র প্রচ্ছন্নরূপে রয়েছে। অতএব, সেইসময় ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েনের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে না।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আজ নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। সে একটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হতে চায়। দক্ষিণ এশিয়াকে তারা তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চল বলেই মনে করে। সিকিমকে ভারত অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে — যে সিকিমকে সংরক্ষিত (protectorate) রাজ্য হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশগুলি পুঁজিবাদী ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশঙ্কিত। এ সমস্ত কিছুই সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র এই সত্যগুলির উপর দাঁড়িয়ে আমরা যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি কি যে, সাম্রাজ্যবাদী ভারতের প্রতিবেশীরূপে যেসব শক্তিশালী অথবা ছোট দেশগুলি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নিজের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য কাশ্মীরকে পদানত করা ভারতের প্রয়োজন? এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে, আমাদের সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, ঋণগ্রহীতা ও উন্নয়নশীল ভারত এখন অর্থনৈতিকভাবে, শিল্পে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সমান হয়ে উঠেছে। এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, এই শক্তি অর্জন করার দ্বারা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীরা নিজের ক্ষমতার জোরেই, আগ্রাসী উদ্দেশ্য থেকে, শুধু ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশই নয়, এমনকি শক্তিধর প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধেও সংঘর্ষে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু কাশ্মীর কেন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত সীমানার প্রতিটি অংশই সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু এধরনের কোনো প্রমাণ দেখা

যাচ্ছে না। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে আসার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই যে, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থেকে না হলেও, সামরিক উদ্দেশ্য থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন।

এখন জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছে, তার মধ্যে কোন ঔপনিবেশিক স্বার্থ যুক্ত হয়ে আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১৯৫৩ সালের আগে, যখন ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত করার জন্য শেখ আবদুল্লার উপর চাপ সৃষ্টি করছিল, সেই সময় দিল্লী সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিল, যেভাবে অন্যান্য পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, কাশ্মীরেরও সেভাবেই যুক্ত হওয়া উচিত; এবং আর্থিক প্রশ্নে, অন্যান্য প্রদেশগুলির (বর্তমানে যেগুলি রাজ্য) সঙ্গে একই পংক্তিভুক্ত হওয়া উচিত। দিল্লীর এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্তির দলিলের শর্ত থেকে বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘটনার মধ্যে উপনিবেশবাদের ইঙ্গিত রয়েছে — একথা কি দাবি করা চলে?

একথাও খেয়ালে রাখতে হবে যে, এই আর্থিক সংযুক্তির দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে নিঃসন্দেহে ক্ষয় করা হলেও জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, তাদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। একমাত্র রাজ্যের নাগরিকরা, জম্মু ও কাশ্মীরই যাদের স্থায়ী বাসভূমি — কেবলমাত্র তারাই ঐ রাজ্যে ব্যবসা ও কলকারখানা খোলার অধিকারী। জম্মু ও কাশ্মীরের বাজার খুলে দেওয়ার যে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তাতে রাজ্যের বাইরের ভারতীয় বা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ঐ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে দিতে হলে, তার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক বহুবিধ সংস্কার ও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে।

অর্থনীতির অন্যদিকগুলি পর্যালোচনা করলেও পরিষ্কার ধরা পড়বে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জম্মু ও কাশ্মীর একটি ঘাটতি রাজ্য। কাজেই ভারতীয় অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ঐ রাজ্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রশ্ন আদৌ ওঠেনা। যে সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে ভারতীয় পণ্য বিক্রির এবং সস্তা কাঁচামাল কেনার সংরক্ষিত বাজার হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে ব্যবহার করা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্ভব নয়। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের ক্ষেত্রে, ভারতের বাকী অংশে ব্যবসা ও কলকারখানা খোলার কোনো বাধা নেই।

জম্মু ও কাশ্মীর অর্থনীতির এই সমীক্ষা থেকে উপনিবেশবাদের কোনো লক্ষণ ধরা পড়ে না।

উপজাতিগত আধিপত্যবাদ

প্রকৃতপক্ষে, জম্মু ও কাশ্মীর একটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক এলাকা হিসাবেই থেকে গিয়েছে। রাজ্যের পরম্পরাগত শিল্পগুলি বাদ দিলে — যেগুলিও রয়েছে অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় — শিল্পায়নের কোনো নতুন পরিকল্পনা সেখানে রূপায়িত হয়নি। ফলে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে ; বেকার যুবকদের সামনে চাকরীর সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু, কল্পনায়ও কি মনে করা সম্ভব যে, এই পরিস্থিতি ঔপনিবেশিক শোষণকে চিহ্নিত করছে? অবশ্য, ১৯৬৪ সালে কাশ্মীর সমস্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের পার্টি বলেছিল যে, "কোনও একটি বহু ভাষাভাষী বহু উপজাতি (ন্যাশানালিটি) বিশিষ্ট দেশে, কোনও বিশেষ উপজাতির, যাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও বিশেষ মানসিক গঠন আছে — তাহারা অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডমিনেটিং (আধিপত্যকারী) কোনও উপজাতির শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা যদি শোষিত অত্যাচারিত হয়, তবে তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিবার অধিকার আছে। এই দাবি সেই বিশেষ উপজাতির অধিকাংশের সমর্থন লাভ করিলে এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনার ফল না হইলে ইহাকে সমর্থন না করিবার কোন্ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? ইহাকে সমর্থন না করার অর্থ কি ডমিনেটিং উপজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করা বোঝায় না? বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনই কি ঔপনিবেশিক শাসনের একমাত্র রূপ? একই দেশে একটি বিশেষ উপজাতির শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আরেকটি উপজাতিকে সমস্ত দিক হইতে শোষণ করা এমনকি 'ফর্মালি' কাগজপত্রে সমান অধিকার দিয়াও আসলে সেগুলিকে কার্যকর না করার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের তফাৎ কোথায়? পূর্বপাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য, ইরাকে কুর্দ উপজাতিদের উপর ইরাকি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার প্রভৃতিকে কি চিন্তাবিদ্‌গণ কার্যত ঔপনিবেশিক অত্যাচারের সামিল বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন না?" (*গণদাবী,* ১৯৬৪)

কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের আন্দোলনের পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যই হোক, কিংবা আন্দোলনের জন্ম হওয়ার পিছনকার সমস্যাগুলির চরিত্রই হোক, কোনটার মধ্যেই ঔপনিবেশিক শোষণ অত্যাচার বা জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো উপাদান নেই। যেটা আছে সেটা একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা উপজাতিগত আধিপত্য কায়েমের (nationality domination) ঘটনা। পুঁজিবাদী ভারতকে সংহত করার লক্ষ্যে বুর্জোয়াশ্রেণী কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন রূপকে সংকুচিত করে তার জায়গায় সারা দেশে একই ধাঁচা চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রয়াস চালাচ্ছে, জম্মু ও কাশ্মীরের ঘটনা তারই অঙ্গ। এর সঙ্গে রয়েছে পুঁজিবাদের মজ্জাগত অসম বিকাশের সমস্যা। প্রাকৃতিক সম্পদ

শোষণ করার উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করা, উৎপাদন ক্ষমতা বা কলকারখানা স্থাপন করা এবং এর জন্য কোন্ এলাকা বা অঞ্চল বেছে নেওয়া হবে — এ সমস্ত কিছুই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্ধারিত হয় যতদূর সম্ভব সবচেয়ে কম সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে। সাধারণভাবে বললে, শিল্প বিকাশের হার-এর সাথে, কোনো ন্যাশানালিটি ছোট না বড় — তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাদ দিলে, ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত হিন্দি ভাষী মূল ভূখণ্ডই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে অনগ্রসর অঞ্চল। অবশ্য এই সত্যের সাথে সাথে এই ঘটনাকেও স্বীকার করতে হবে যে, প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বৃহৎ উপজাতিগত উগ্র দম্ভ এবং শাসকদলের উপর প্রভাব খাটাবার জন্য এই বৃহৎ উপজাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এক সাধারণ ঘটনা হিসাবে বিরাজ করছে — যার পরিণতিতে, প্রায়ক্ষেত্রেই, অবদমিত উপজাতিগুলির বিকাশ ও অগ্রগতির বিনিময়ে প্রধান ও প্রভুত্বকারী উপজাতিগুলিই সিংহভাগ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দখল করছে। বহু উপজাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষের সর্বত্রই এটি অত্যন্ত সাধারণ এক ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীরও এর ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু একে, ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্যের সমগোত্রীয় করা চলতে পারেনা।

কাশ্মীর পরিস্থিতিতে পরিমাণগত পরিবর্তন

এই বিশ্লেষণ থেকে এই সত্যই বেরিয়ে আসছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তন অবশ্যই সেখানে ঘটেছে। সেজন্য, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের পার্টি লাইন — যা আজও সঠিক, তার উপলব্ধিকে বর্তমান ঘটনাবলীর আলোকে উন্নত করতে হবে।

সবচেয়ে আগে, এই পরিমাণগত পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করা জরুরী।

কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের ভারত বিমুখতা গত ছ'বছরে কি রূপ নিয়েছে, তা আমরা খুঁটিয়ে বিচার করেছি। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, দেশীয় রাজার শাসনকালের দিনগুলিতে শেখ আবদুল্লা নিজে মনে করতেন এবং বলতেন "ভারতবর্ষ আমাদের দেশ এবং সর্বদা সেটাই থাকবে।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, ১৯৪৩ সালে বা তার অল্প পরেই ন্যাশানাল কনফারেন্সের মীরপুর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ*)। সামন্তী শাসন থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকার সময় শেখ আবদুল্লার এই মনোভাবের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের বর্তমান মনোভাবকে মেলালেই আমরা বুঝতে পারি, আজকের পৃথকতা বা ভারতবিমুখতা কত গভীর ও কতদূর বিস্তৃত।

কিন্তু এটা শুধুমাত্র বিগত ছয় বছরের ঘটনাবলীর পরিণতিতেই ঘটেনি। এই প্রক্রিয়া সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল যখন কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন অন্তর

অন্তর শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং কাশ্মীরের বুকে একের পর এক পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের মনে ভারতীয়তার যে বোধ তখন ভ্রূণাবস্থায় ছিল, এইসব ঘটনায় তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে; সেই জায়গায় কাশ্মীরী আত্মপরিচয়ের ভাবনা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এহল কাশ্মীরের পরিবর্তনগুলির একটি দিক।

এটাও সামনে এসেছে ও বিচার করা হয়েছে যে, কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত আঞ্চলিক ও এথনিক গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করে, উপজাতিগত বা ন্যাশানালিটি ভাবনার কোনও অভিন্ন বন্ধন সেখানে গড়ে উঠতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে আবার এটাও দেখানো হয়েছে যে, এই আঞ্চলিক ও 'এথনিক' গোষ্ঠীগত ভাবনা-ধারণা অন্য কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে পরবর্তীকালে উপজাতিগত ভাবনার চরিত্র পরিগ্রহ করেছে — যার ফলস্বরূপ জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে। পরিবর্তনের এটি দ্বিতীয় দিক।

পরিবর্তনের তৃতীয় দিক হচ্ছে, স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপক ক্ষয়। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে কাশ্মীরী জনগণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বৈষম্যপূর্ণ আচরণ। নিচের ঘটনাগুলি এরই সাক্ষ্য বহন করছে। শেখ আবদুল্লা বলেছিলেন, "অন্তর্ভুক্তির সময় এই মর্মে একটি অলিখিত বোঝাপড়া হয়েছিল যে, সেনাবাহিনীতে কাশ্মীরী জনগণের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে। কি নিদারুণ আঘাত আমরা পেয়েছিলাম, যখন আমরা জানতে পারলাম যে, এক গোপন সার্কুলার জারি করে সামরিক বাহিনীতে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের রিক্রুট না করার জন্য অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্যাটেলের মৃত্যুর পর, বিষয়টি আমরা, পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের (শেখ আবদুল্লা তাঁর বইয়ে গোপালস্বামীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে বর্ণনা করেছেন — সম্পাদক) নজরে এনেছিলাম। বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সে সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন কারগিলের মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি? উত্তরে জেনারেল বলেছিলেন, ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্য নিয়ে সংশয় রয়েছে।.....সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতেও এইরকম অবিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। ডাক বিভাগের চাকরি থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের দূরে রাখা হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলার চেষ্টার পরিবর্তে, এই দপ্তরের অফিসাররা ঠিক বিপরীত কাজই করেছিলেন! বিষয়টি আমি মৌলানা আজাদকে জানিয়েছিলাম। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন অফিসাররা ওনার সামনে বিষয়টাকে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে পেশ করলেন; কেউই আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না।" (*শেখ আবদুল্লার 'ফ্লেমস্ অফ চিনার', পৃঃ*-১২২)

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য

স্বভাবতই, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে এইসব যাবতীয় বিষয় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বুকে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে বিবেচনার মধ্যে নিয়েই। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বিচারের নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি দিক — যা ১৯৬৪ সালে আমরা তুলে ধরেছিলাম, এখানে আমরা পুনরায় উল্লেখ করতে চাই। সেইসময় আমরা বলেছিলাম ঃ প্রথমত "....বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রযোজ্য হইতে পারে। কোনও একটি বহু ভাষাভাষী উপজাতি বিশিষ্ট দেশে, কোন বিশেষ উপজাতির, যাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও বিশেষ মানসিক গঠন আছে — তাহারা অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডমিনেটিং কোনও উপজাতির শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা যদি শোষিত অত্যাচারিত হয় তবে তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিবার অধিকার আছে।"

".....আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যে সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা বোঝায় তাহা নহে। বহু উপজাতি বিশিষ্ট স্বাধীন দেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে স্বায়ত্তশাসনকেও বোঝায়। এইরূপ ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি আসলে স্বায়ত্ত শাসনের দাবির পর্যায়ভুক্ত হয়।"

".....জাতি গড়িয়া উঠিবার ক্ষেত্রে ধর্ম প্রধান ভিত্তি ত' নয়ই, এমনকি অন্যতম উপাদান হিসাবেও তাহার স্থান নাই। ধর্মের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কোনও অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকগণ নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করিবেন যে, ধর্মভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বলিতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ তো বোঝায়ই না, আসলে উহা সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর মাত্র। পাকিস্তান গঠনের দাবি তাই সমর্থন যোগ্য ছিল না। (*গণদাবী,* ১৬-৪-১৯৬৪)

অবশ্য একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। শেষোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে ভিত্তি করে দেশগঠনের যে তত্ত্ব জিন্না উপস্থিত করেছিলেন, তার সাথে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনুসৃত, এমনকি স্বয়ং শেখ আবদুল্লা এবং তার দল ন্যাশানাল কনফারেন্স কর্তৃক অনুসৃত ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে এক করে ফেলা উচিত নয়। এটা ইতিহাসে সর্বজনবিদিত যে, শুধু নিরীশ্বরবাদীরাই জাতীয়তাবাদের পক্ষে দাঁড়াননি, ধর্মবিশ্বাসী মানুষও দাঁড়িয়েছেন। নিরীশ্বরবাদীদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ, যা কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে। আর ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব যেহেতু সর্বহারা বিপ্লব ভীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তাই তারা বৈজ্ঞানিক চিন্তার পক্ষে দাঁড়ায়নি, তার বিরোধিতাই করেছিল; তারা উৎসাহ যুগিয়েছিল ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক জাতীয়তবাদী চিন্তায়। স্বাভাবিকভাবেই, ধর্মীয় মূল্যবোধকে ভিত্তি

করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ এদেশের সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এটা একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এক জিনিস, কিন্তু তাকে ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠনের ধারণার সঙ্গে এক করে ফেলা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক।

আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আরো একটি দিক খেয়ালে রাখতে হবে। কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যদি নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ন্যায়সঙ্গত দাবি রূপে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাই আত্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট প্রকাশ, তবে মার্কসবাদীরা তা সমর্থন করবে। শুধু সমর্থন করবে তাই নয়, উপরন্তু বিচ্ছিন্নতাকে সার্থক করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে তারা সক্রিয় ভূমিকাও নেবে।

এধরনের পরিস্থিতিতে কোনরকম অস্পষ্টতা চলতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে কোনও মার্কসবাদীরই বহুরকম (variegated) দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া চলতে পারে না — যেমন কাগজে কলমে বিচ্ছিন্নতার অধিকার প্রদান করা, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা কার্যকর করার পক্ষে ঐতিহাসিক যৌক্তিকতার মুখোমুখি হয়ে ঐ অধিকার প্রয়োগের বিরোধিতা করা। এই ধরনের মনোভাব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে উদ্দেশ্যহীন করে দেয়।

শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি

একটি বহু উপজাতি, বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশে শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা আধিপত্যকারী উপজাতির বুর্জোয়াদের সমস্ত প্রকার উপজাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং একই সাথে অবদমিত উপজাতির বুর্জোয়াদের বিশেষ সুবিধা ও উপজাতীয় সংকীর্ণতারও বিরোধিতা করে। পাশাপাশি, যে সর্বহারা বিপ্লবই একমাত্র পারে উপজাতিগুলির মধ্যে বৈষম্যসহ সমস্ত প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে, সেই সর্বহারা বিপ্লবের জমি এক বৃহত্তর ভূখণ্ড জুড়ে প্রস্তুত করার জন্য, শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপকতর ও বৃহত্তর বিকাশ ঘটাবার স্বার্থে সাধারণভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যেই সমস্ত উপজাতিগুলির ঐক্য বজায় রাখার জন্য শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা চেষ্টা করে। কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে — ভাষাগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে উপজাতিগত উৎপীড়ন অত্যন্ত তীব্র ও অনিরসনীয় হয়ে ওঠে, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ন্যায়সঙ্গত দাবি ওঠে, তবে শ্রমিকশ্রেণীকে সেই দাবি সমর্থন করতে হবে; অবশ্য সেই দাবি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং ধর্মীয় মৌলবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে মুক্ত হলে তবেই শ্রমিকশ্রেণী তাকে সমর্থন করবে। একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, এই সংগ্রাম একমাত্র তখনই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি পেতে পারে, যখন তা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

কাশ্মীরকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে

যাই হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্বোল্লিখিত মানদণ্ড কাশ্মীরের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, কাশ্মীর সমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান হচ্ছে — অন্তর্ভুক্তির সময়ে যেভাবে ভাবা হয়েছিল সেইমত কাশ্মীরকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া। এর অন্য কোন বিকল্প নেই। অন্তর্ভুক্তির দলিলে বর্ণিত পথে কাশ্মীর উপত্যকার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের দ্বারাই একমাত্র, পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী জোরদার উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন কাশ্মীরী জনগণকে অন্তত কিছুটা আস্থা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং, কোনোরকম দ্বিধা না করে, জম্মু ও কাশ্মীরের তথাকথিত নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে এটাকে পরিণত না করে, উপত্যকায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে মনে রাখতে হবে — কাশ্মীর উপত্যকার নিপীড়িত ও অবদমিত জনগণ, বিলুপ্ত স্বায়ত্তশাসনের পরিস্থিতির মধ্যে, সামরিক শক্তির জোরে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের উপর আস্থা রাখতে পারে না।

বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে দেওয়া আরো বেশী জরুরী এই কারণে যে এবার জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে জম্মু ও লাদাকের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। এইসব এলাকার প্রতিনিরিা, তাদের নিজস্ব উপজাতিগত স্বার্থবোধের জায়গা থেকে সামগ্রিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণের প্রশ্নে, কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সহমত না-ও হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক উপজাতিগুলির আশা-আকাঙ্খা, যা এমনকি ন্যাশানাল কনফারেন্সের দ্বারাও স্বীকৃত, তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই কাজটি বর্তমান সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যন্তরে উপযুক্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থার দ্বারাই একমাত্র করা যেতে পারে।

কিন্তু, স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের এই সমস্ত ব্যবস্থা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ এবং ভারত সরকারের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, যদি না সমস্ত ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কাশ্মীরী জনগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অনুসৃত বৈষম্যপূর্ণ নীতি এখনই পুরোপুরি বাতিল করা হয়। কাশ্মীরের জন্য করণীয় কাজগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরী জনগণ নিজেরা একাই নিজেদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ একদিকে তাদের সংগ্রামকে বিপথগামী করা হচ্ছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। যেটা অত্যন্ত জরুরী তা হচ্ছে — কাশ্মীরের সমগ্র সমস্যাটিকে ঠিক ঠিক মতো বোঝা, তাকে বিশ্লেষণ করা, তার চরিত্র নিরূপণ করা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ভেতরে ও বাইরে সমগ্র জনগণের সামনে তাকে উপস্থিত করা, যাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ভেতরের ও বাইরের জনগণ একসঙ্গে মিলে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাগুলি নির্ণয় করতে

পারে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ভেতরে ও বাইরে যুক্ত উদ্যোগ ও যুক্ত সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে।

কাশ্মীর সমস্যা মূলত কংগ্রেস, বিজেপি'রই সৃষ্টি

আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, গোটা সমস্যাটাই মূলত কংগ্রেস ও বিজেপি'র সৃষ্টি। এই দুই দল যে পরিস্থিতি সেখানে তৈরী করেছে, তারই সুযোগ নিয়েছে মুসলিম মৌলাবাদীরা, পাকিস্তান এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। এই দুই দল কাশ্মীর সম্পর্কে শুধু ভারতীয় জনগণকে ভুল সংবাদই পরিবেশন করেনি, শেখ আবদুল্লাকে জেলে পুরতে মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলেছে যে, 'তিনি স্বাধীন কাশ্মীর চান।' শুধু তাই নয়, উপত্যকার জনগণের বিরুদ্ধে তারা ভারতের বাকী জনগণের মনকে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক ছাঁচে তৈরী করার চেষ্টা করেছে। একদিকে এই মিথ্যাচার ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার আশ্রয় নিয়ে এবং অন্যদিকে কাশ্মীর উপত্যকার যাবতীয় বিদ্রোহের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে এই দুটি দল — জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা হরণ করা এবং উপত্যকার মানুষদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার মতো ঘৃণ্য কার্যকলাপকে যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে। এইসব মিথ্যাচার ও উগ্র উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে আচ্ছন্ন হয়ে ভারতীয় জনগণ কাশ্মীর উপত্যকার নির্যাতিত জনসাধারণের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে। ভারতের জনগণের এই মনোভাবকে বেশি করে বিষাক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে আরো একটি কারণে। সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন উপজাতির বা ন্যাশানালিটির একীকরণের জন্য কোন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশের মধ্যে নেই। এই ধরনের আন্দোলনের অনুপস্থিতির ফলে নানা উপজাতির জনগণ — উপজাতিগত একান্ত ভাবনাচিন্তা ছন্দ্বপ্রন্তপুত্তব্দল্লন্দ্ধন্দ্বব্দব্দগ্ন বা উপজাতিগত পৃথকতার প্রভাব, একের অপরের প্রতি উদাসীনতা, অবিশ্বাস এবং বৃহৎ উপজাতি দম্ভের শিকার হয়ে রয়েছে।

এস.পি, এস.এস.পি, পি.এস.পি'র ঘৃণ্য ভূমিকা

এ ঘটনাও ইতিহাসে রয়েছে যে, সোস্যালিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদির মতো এক একসময় এক এক নাম নিয়ে চলা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলি বরাবর সক্রিয়ভাবে শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধতা করেছে। শুধু তাই নয়, ৩৭০ ধারা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম দিককার রাজনৈতিক লাইনকে পরবর্তীকালে বদলে দিতে এরা মদত জুগিয়েছে। বলরাজ পুরী তাঁর বইয়ে ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কিভাবে তিনি নিজে প্রয়াত অশোক মেহতার মতো নেতাদের সাথে নেহরুকে গিয়ে বলেছিলেন যে, ভারত থেকে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতার বিপদ আসন্ন এবং শেখ আবদুল্লা আমেরিকার সঙ্গে যোগসাজসে এই পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন। শেখ আবদুল্লাকে অপসারিত

করার ষড়যন্ত্রে এইসব সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অবিভক্ত সিপিআই'র লজ্জাজনক আচরণ

শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তার এবং তারপর জম্মু ও কাশ্মীরে একের পর এক জো-হুজুর ও পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর সমগ্র অধ্যায়ে সবচেয়ে লজ্জাজনক ছিল সি পি আইয়ের ভূমিকা। শেখ সাহেব নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে সি পি আই নেতাদের অভিযুক্ত করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "জওহরলাল নেহেরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পাত্র রফি আহমেদ কিদোয়াই ছিলেন রুশ লবির সঙ্গে যুক্ত। জেডএ আহমেদ, কে এম আস্‌রাফ, রামমূর্তি, হরকিষেণ সিং সুরজিতের মত কমিউনিস্ট নেতারা কিদোয়াইয়ের ঘনিষ্ঠ পাত্রদের খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, জি এম সাদিকের মতো তাঁদের কৃপাপ্রার্থীদের স্বার্থ দেখতে। ফলে, আমাকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর জন্য কিদোয়াইয়ের প্রয়াসকে তাঁরা সমর্থন করেন।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃঃ ১১৯*) "কমিউনিস্টরা, বক্সি গুলাম মহম্মদকে সমর্থন করল। তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে তাঁরা তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বক্সির দুর্বলতা জানতেন এবং আশা করেছিলেন, কোনো এক উপযুক্ত সময়ে সাদিক সাহেবকে তাঁরা ক্ষমতায় বসাতে সক্ষম হবেন। বাস্তবে দেখা গেল, বক্সির চাতুরি পুরোপুরি বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। সে ধীরে ধীরে তার জায়গা পাকা করে নিল এবং তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে এক গুরুতর আঘাত হানল। সরকারের উপর তার কর্তৃত্বকে সে আরো শক্ত করল এবং নিজের ভাইপো বক্সি আবদুল রশিদকে ন্যাশানাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে বসিয়ে দিল। আমাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে দুর্গাপ্রসাদ দার এক জঘন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।" (*ঐ, পৃঃ ১২৭-১২৮*)

"আরো একটি গল্প নানা মহলে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি নাকি কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছি এবং কাশ্মীরকে আর একটি কোরিয়ায় পরিণত করতে চাইছি। এই মিথ্যা ছড়াবার কাজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।" (ঐ)

শেখ আবদুল্লার এই অভিমত, ২৩-২৯শে জুলাই ১৯৫৩-তে অনুষ্ঠিত সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কাশ্মীর থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তা লক্ষ্য করছে। এই সংবাদে প্রকাশ, শেখ আবদুল্লা গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ন্যাশানাল কনফারেন্সে তাদের সমর্থকরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীর রাজ্যকে ভারত থেকে স্বাধীন করতে হবে এবং নতুন অবস্থান ভারত, পাকিস্তান এবং রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।"

এই প্রস্তাবের পর সি পি আই পলিটব্যুরোর একটি বিবৃতি ১৬ই আগস্ট,

১৯৫৩ 'ক্রস্ রোড্স্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, "সদর-ই-রিয়াসতে'র দ্বারা শেখ আবদুল্লার অপসারণ এবং একটি নতুন কাশ্মীর সরকার গঠনের ঘটনা, এ্যাড্লাই স্টিভেনসনের (*আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী — সম্পাদক*) কাশ্মীর সফরের পর সেখানে উদ্ভুত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিণতিতে ঘটেছে।"

"শেখ আবদুল্লা মার্কিন চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং একটি স্বাধীন কাশ্মীর গড়ে তোলার দিকে এগুচ্ছেন। এই স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা, অর্থাৎ আমেরিকার দ্বারা সুরক্ষিত হবে।" (*ডকুমেণ্টস্ অফ দি হিস্ট্রি অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, ভল্যুম-৮, ১৯৫১-৫৬, পৃঃ-২৫৮,২৬৪*)

"মৌলভী সঈদ (ন্যাশানাল কনফারেন্সের) সাধারণ সম্পাদক পদেই থেকে গেলেন। তাঁকে জেনারেল এ্যাসেম্বলি'র বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রামবনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ, ডি পি দার চেয়েছিলেন, কমিউনিস্টরা যাতে ন্যাশানাল কনফারেন্সের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে, তার জন্য সমস্ত বাধা কাটিয়ে দিতে।" (*ফ্লেমস্ অফ চিনার, পৃ-১২৭*)

সি পি আই (এম)-এর ভূমিকা

এইভাবে কাশ্মীর নীতির প্রশ্নে সি পি আই নিজেকে কংগ্রেস, বিজেপি ও পি এস পি'র সমগোত্রীয় করে তুলেছিল। কংগ্রেসের শুরু করা অপকর্মকে তারা সম্পূর্ণ করেছিল। সি পি আই (এম)ও একটি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হিসাবে, সি পি আই-এর মতই একই লাইন অনুসরণ করেছে। কাশ্মীরী জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের নিরন্তর দমনের কেন্দ্রীয় সরকারী ভূমিকা এবং সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরেও তারা কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, সংসদের বাইরেও কোনো গণআন্দোলন গড়ে তোলেনি; শুধু তাই নয়, কাশ্মীর প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের লাইনকেই তারা পুরো সমর্থন জানিয়েছে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে কেন সি পি আই, সি পি আই(এম) সর্বদাই উগ্র জাতিদম্ভের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

ফলে, দেশের শ্রমিকশ্রেণী, নিপীড়িত ও অপমানিত কাশ্মীরী জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ কখনো পায়নি।

এই কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব এস ইউ সি আই-এর উপরই বর্তায়। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে এবং পরবর্তী সময়ে আরো বহু লেখায়, ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। এখনও এস ইউ সি আই, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের জন্য কাশ্মীরী জনগণ যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তার পাশেই রয়েছে।

এস ইউ সি আই-এর আবেদন

একই সাথে, আমাদের পার্টি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছে যে, আমাদের সঠিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও লাইনের সাহায্যে কাশ্মীরের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করতে, কিংবা উপত্যকার জনগণের কণ্ঠরোধকারী ভারত সরকারের ফ্যাসিবাদী দমনপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সামিল করে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে এখনো পর্যন্ত আমরা সমর্থ হইনি।

জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরের সমস্ত উপজাতিগুলির সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে এসত্যও স্বীকার করতে হবে যে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে, ভারত সরকার কর্তৃক কাশ্মীরী জনগণের আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খাকে দমন করার ফলশ্রুতিতে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদায় যে আঘাত লেগেছে, তাকে সহানুভূতির সঙ্গে দূর করতে হবে। তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে কাশ্মীর প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিসমূহের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে উপত্যকার সাধারণ মানুষ, প্রগতিশীল যুবসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের, এমনকি ভ্রূণ অবস্থাতেও যদি কোন আন্দোলন থেকে থাকে, সেই আন্দোলনকেও যুক্ত করে। একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই উপত্যকার শ্রমিক-চাষীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং সেখানকার পাকিস্তান-ঘেঁষা ও সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে বর্জন করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। একথাও বুঝতে হবে, জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে, শুধু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারই যথেষ্ট নয়। বৃহৎ উপজাতিগুলির জনগণের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে যে বৃহৎ উপজাতিগত উগ্র দম্ভ ও মানসিকতা রয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা;অত্যাচারিত উপজাতিগুলি, বিশেষ করে তুলনায় ছোট ও দুর্বল উপজাতিগুলির আত্মপরিচয় ও মর্যাদাকে সম্মান করা এবং দৃঢ়ভাবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের ইজারাদার হিসাবে আঞ্চলিক 'এলিট' অংশ — যারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-মুনাফার আকাঙ্খা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত — তাদের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যে সংকীর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠছে, তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম গড়ে তোলা জরুরী। উপজাতিগুলির আইনসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্খাকে সফল ও সার্থক করার আন্দোলন এবং উপজাতিগুলির ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খাকে কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক সৃষ্টি করে সংসদীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার আন্দোলন — এই দুয়ের পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে উপজাতি সমস্যা এবং বিশেষ করে কাশ্মীরের মতো জ্বলন্ত উপজাতি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত জরুরী।

এই পরিস্থিতিতে, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কাশ্মীর সমস্যার এক স্থায়ী

সমাধানে পৌঁছুতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, কাশ্মীরী জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত বর্বর সামরিক অত্যাচার ও নিপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করা। মিলিটারিকে অবিলম্বে ব্যারাকে ফেরত পাঠাতে হবে এবং অসামরিক শাসন পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দিতে, ৩৭০ ধারাকে — অন্তর্ভুক্তির সময়ে তা যে রূপে ছিল, সেই চেহারায় দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে হবে।

কিন্তু, একইসাথে একথাও পরিষ্কার যে, সরকার তার যুদ্ধবাজ সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করবে এবং এই দুই দাবি মেনে নেবে — এমন কোনো লক্ষণই নেই।

ভারত সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি

পরিশেষে, আমাদের পার্টি, ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চায় — বাস্তবেই কাশ্মীরে 'আজাদী'র শ্লোগান উঠেছে এবং যদিও তা এখনো পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কোনো গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার ও দেশপ্রেমী নেতৃত্বের পরিচালনায়, গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, তথাপি এই শ্লোগানকে উপেক্ষা করা হলে, ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তিকে (integration) বিপন্ন করার ঝুঁকিই নেওয়া হবে। এবং এখনও যদি জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ স্বশাসিত মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনোরকম টালবাহানা করা হয়, তবে তা 'আজাদী'র জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও গণসংগ্রাম, দুয়েরই জন্ম দিয়ে দেবে। জনগণের উপর ঔপনিবেশিক অত্যাচারের দুনিয়াব্যাপী দীর্ঘ ইতিহাস থেকে এই সত্য বুঝে নেওয়া জরুরী যে, উৎপীড়ক রাষ্ট্রের জনগণ শেষপর্যন্ত ঐ রাষ্ট্রের দ্বারা উৎপীড়িত জনগণের পাশে গিয়েই দাঁড়ায়। সেরকম পরিস্থিতি এলে আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম হবে — এমন আশা করা চলে না। মনে রাখতে হবে, জম্মু ও কাশ্মীরের এবং ভারতের বাকী অংশের শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ দাবি করে, তাদের সকলের শত্রু অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম; এই সংগ্রামের ঐক্যই গড়ে তুলতে হবে এবং যেকোন মূল্যে তাকে রক্ষা করতে হবে।